গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু

প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু

প্রফেসর ইসমাত রুমিনা

সোনিয়া বেগম

গাজী হোসনে আরা

শামসুন নাহার বীথি

সৈয়দা সাদিয়া সাজিহীন সুলতানা

রেহানা ইয়াছমিন

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	**অক্টোবর ২০২৪**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জ রি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান একটি জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। এই বিষয়ে অর্জিত দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও এর অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে, গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলা করতে এবং গৃহপরিবেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তুলবে। ষষ্ঠ শ্রেণির **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকটি এসব বিষয় বিবেচনা করে এবং সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিভাগ ও অধ্যায়ের শিরোনাম

অধ্যায়	ক বিভাগ– গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা (১-২২)	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৃহ ও গৃহ পরিবেশের প্রাথমিক ধারণা	২
দ্বিতীয়	গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১১
তৃতীয়	গৃহ ব্যবস্থাপনা	১৬
	খ বিভাগ– শিশু বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক (২৩-৫৯)	
চতুর্থ	পরিবার ও শিশু	২৪
পঞ্চম	ছেটিদের শিষ্টাচার শিক্ষা	৩৪
ষষ্ঠ	কৈশোরকালীন বিকাশ	৪৫
সপ্তম	কৈশোরকালীন পরিবর্তন ও নিজের নিরাপত্তা রক্ষা	৫৫
	গ বিভাগ– খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা (৬০-৯৮)	
অষ্টম	খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য	৬১
নবম	খাদ্যের পুষ্টিমূল্য	৭১
দশম	খাদ্য চাহিদা	৮২
একাদশ	খাদ্যাভ্যাস গঠন	৯১
	ঘ বিভাগ– বস্ত্র ও পরিচ্ছদ (৯৯-১৩২)	
দ্বাদশ	বস্ত্র ও পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা	১০০
ত্রয়োদশ	বয়ন তন্তুর ধারণা	১০৭
চতুর্দশ	পোশাকের যত্ন ও সংরক্ষণ	১১৬
পঞ্চদশ	সেলাইয়ের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়	১২২

ক বিভাগ

গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা

গৃহ মানুষের জীবনের প্রথম পরিবেশ। একটি শিশুকে সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এই পরিবেশকে গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নত করা যায়। এখানে আমরা নানাবিধ কাজ করি। কাজের স্থানগুলো শনাক্ত করে, কোথায় কী কাজ করব তা জানা থাকলে কাজ সহজ হয়। গৃহের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। গৃহকে পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখতে হলে জিনিসপত্র যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করলে প্রতিটি কাজেই সফলতা আসে।

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- গৃহ ও গৃহ পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহের কাজের স্থান শনাক্ত করতে পারব।
- ব্যবহারের পর জিনিসপত্র নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে শিখব।
- গৃহ পরিবেশে গাছ লাগানোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহ ও গৃহ পরিবেশ পরিষ্কার রাখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব ।
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

গৃহ ও গৃহ পরিবেশের প্রাথমিক ধারণা

পাঠ ১- গৃহ ও গৃহ পরিবেশ

গৃহ - তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, আদিম যুগের মানুষ আমাদের মতো গৃহে বাস করত না। হিংস্র বন্য প্রাণীর আক্রমণ এবং ঝড়, বৃষ্টি, শীত-তাপ ইত্যাদির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা শুধু একটা আশ্রয়স্থল খুঁজে নিত। এই আশ্রয়স্থলগুলো ছিল বন জঙ্গল, বড় গাছ, পাহাড়ের গুহা ইত্যাদি।

পরবর্তীতে মানুষ ধীরে ধীরে যখন চাষাবাদ শিখল, তখন তারা একত্রিত হয়ে পরিবার গঠন করল। পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য তারা গৃহের প্রয়োজন অনুভব করল এবং গৃহ নির্মাণ করতে শিখল। এভাবে গৃহের সূচনা হলো।

আমরা বলতে পারি, গৃহ এমন একটা স্থান যেখানে আমরা পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করি। গৃহ আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমরা আমাদের বিভিন্ন রকম চাহিদা পূরণের জন্য সারাদিন নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকি। কাজের শেষে বিশ্রাম ও আরামের জন্য আমরা গৃহে ফিরে আসি। ফলে আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। গৃহে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিনোদন, বিভিন্ন শখ ইত্যাদি চাহিদা পূরণ হয়। এখানে সবার প্রতি সবার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহযোগিতা থাকার ফলে পারিবারিক বন্ধনটাও মজবুত হয়।

গৃহ পরিবেশ- প্রতিটি মানবশিশুর জীবনের প্রথম পরিবেশ হলো গৃহ। আশেপাশের সবকিছু নিয়ে গৃহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গৃহের ভিতরে ও বাইরের সব অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে গৃহ পরিবেশ। পরিবারের সদস্যদের সুখ, শান্তি এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে গৃহ পরিবেশের উপর।

গৃহ পরিবেশের মধ্যে থাকে–

- বিভিন্ন ঘর বা কক্ষ
- ছাদ/চালা
- বারান্দা
- আঙিনা ইত্যাদি।

পরিবারের সদস্যদের সবরকম বিকাশের জন্য সুন্দর একটি গৃহ পরিবেশ দরকার। আমরা সবাই শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই পরিবেশেই বসবাস করি, তাই ব্যক্তি জীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। এখান থেকেই আমাদের বিভিন্ন অভ্যাস, রুচিবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ গড়ে ওঠে। গৃহ পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে আমরা বিভিন্ন রকম কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি। ফলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ গড়ে ওঠে। আর তাই গৃহ পরিবেশটাও হওয়া দরকার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য-সম্মত এবং সুশৃঙ্খল। তাহলেই গৃহের মানুষগুলো সুস্থ ও সুশৃঙ্খল হয়ে গড়ে উঠবে যা আদর্শ জাতি গঠনে সহায়ক হবে। গৃহের সব পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণ মুক্ত রাখা দরকার। সেজন্য গৃহে যে সব ব্যবস্থা থাকতে হবে–

- সূর্যের আলো প্রবেশ ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।
- বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ফর্মা-১

- গৃহের ভিতরে ও বাইরে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা।
- ময়লা পানি ও মলমূত্র নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখা।
- গৃহে সৃষ্ট ধোঁয়া নির্গমনের ব্যবস্থা থাকা।
- গৃহের আঙিনায় জায়গা থাকলে সেখানে ছোট-বড় গাছ এবং প্রয়োজনে টবে বিভিন্ন গাছ লাগানো।

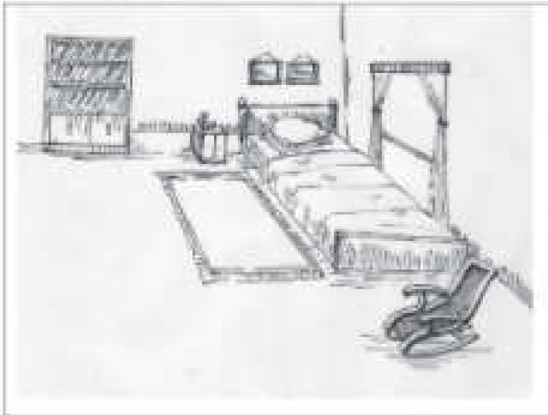

পরিচ্ছন্ন ও গোছালো গৃহ পরিবেশ

অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালো গৃহ পরিবেশ

শহর ও গ্রামে গৃহের ধরন আলাদা হয়। শহরে পাকা বাড়ি তৈরি হয় ইট, বালু, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি দিয়ে। আর গ্রামে সাধারণত কাঁচা বাড়ি দেখা যায়। যেগুলো টিন, কাঠ, বাঁশ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি।

কাজ ১– গৃহের পরিবেশ রক্ষায় তুমি কী কী করতে পারো, তার একটা তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২– গ্রামের একটি গৃহ ও শহরের একটি গৃহের তুলনা করো।

পাঠ ২- গৃহের অভ্যন্তরীণ স্থানের বিন্যাস

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, আমাদের গৃহে বিভিন্ন রকম স্থান আছে। গৃহে প্রবেশ করার দরজা থেকে শুরু করে বারান্দা, বিভিন্ন ঘর, বাগান, গাড়ি বারান্দা ইত্যাদি সবই গৃহের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান। গৃহে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়। এক এক ধরনের কাজ এক এক জায়গায় করা হয়ে থাকে। গৃহের বিভিন্ন কক্ষ বা স্থানের বিন্যাস এই কাজের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। যেমন– রান্না, খাওয়া দাওয়া, গোসল, পড়ালেখা, সাজসজ্জা, বিশ্রাম, ঘুমানো, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি। এই কাজগুলো প্রত্যেকটাই আলাদা ধরনের। ফলে এই কাজের স্থানগুলোও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

গৃহের কাজের উপর ভিত্তি করে গৃহের অভ্যন্তরীণ স্থানকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। আনুষ্ঠানিক স্থান
২। অনানুষ্ঠানিক স্থান
৩। কাজের স্থান

আনুষ্ঠানিক স্থান- আনুষ্ঠানিক স্থান বলতে বোঝায় যেখানে আনুষ্ঠানিক কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। এখানে আমরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করি। আমাদের গৃহে কোনো অতিথি, বন্ধু বান্ধব এলে আমরা আনুষ্ঠানিক স্থানগুলোতে তাদের অভ্যর্থনা জানাই, আপ্যায়ন করি। কখনও কখনও তাদের থাকার ব্যবস্থা করে থাকি।

এই স্থানগুলোর মধ্যে আছে-

- বসার ঘর বা ড্রইং রুম
- খাওয়ার ঘর
- অতিথি ঘর
- গাড়ি বারান্দা
- সিঁড়ি ইত্যাদি।

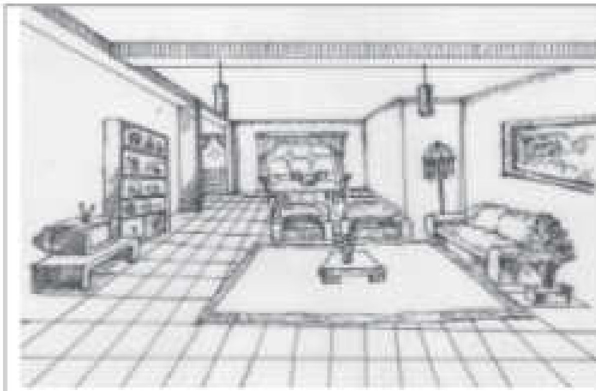

একটি আনুষ্ঠানিক স্থান

অনানুষ্ঠানিক স্থান- অনানুষ্ঠানিক স্থান বলতে বোঝায় সাধারণত আমরা যে স্থানগুলোতে ব্যক্তিগত বা একান্ত নিজের কাজগুলো করে থাকি। এখানে আমরা বিশ্রাম নেই, ঘুমাই, পড়াশোনা করি, সাজসজ্জা করি ইত্যাদি। এই স্থানগুলোতে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই তাদের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তাই এখানে কিছুটা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। অনানুষ্ঠানিক স্থানগুলোর মধ্যে পড়ে-

- শোবার ঘর
- পড়ার ঘর
- সাজসজ্জার ঘর ইত্যাদি।

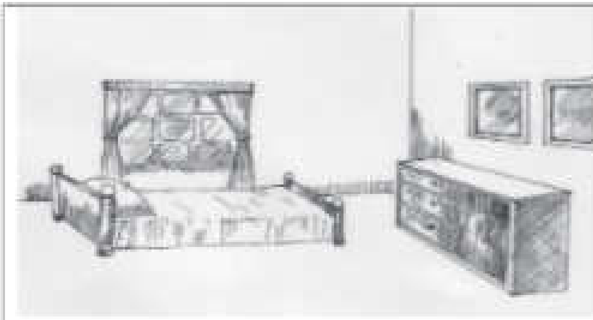

একটি অনানুষ্ঠানিক স্থান

কাজের স্থান- এই স্থানে প্রতিদিন গৃহের বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়ে থাকে। যেমন- রান্না করা, বিভিন্ন রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, বিভিন্ন দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

রান্নার কাজের মধ্যে খাবার রান্নার জন্য প্রস্তুতি অর্থাৎ কোটা, বাছা, ধোওয়া, মসলা বাটা ইত্যাদি থেকে শুরু করে রান্না করা সবই থাকে। তাছাড়া খাবার পরিবেশন করার জন্য বাসনপত্র, গ্লাস, জগ, চামচ, ছুরি, কাঁটা চামচ, টেবিল ম্যাট ইত্যাদি যথাযথভাবে রাখার কাজগুলো হয়ে থাকে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে কাপড়-চোপড় ধোওয়া, ইস্ত্রি করা, ঘর মোছা বা লেপা, সিলিং, দরজা-জানালার গ্রিল ও কাঁচ, বাথরুম, টয়লেট, ঘরের আঙিনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা। কাজের স্থানগুলো হলো–

- রান্না ঘর
- বাথরুম ও টয়লেট
- ভাঁড়ার ঘর বা চাল, ডাল শস্য ইত্যাদি সংরক্ষণের স্থান
- কাপড়, তৈজসপাতি বা বাসন পেয়ালা ধোয়ার স্থান
- কোটা-বাছার স্থান

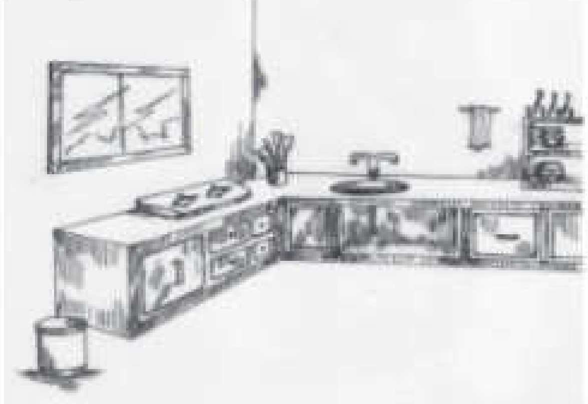

একটি কাজের স্থান

কাজ ১– তোমার বাড়িতে তোমার বন্ধু পরিবারসহ বেড়াতে এলে তাকে কোথায় কীভাবে অভ্যর্থনা করবে?
কাজ ২– বাড়ির অনানুষ্ঠানিক স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেখানে কী কী কাজ করা হয় লেখো।

পাঠ ৩- প্রয়োজনীয় জিনিস যথাস্থানে সংরক্ষণ

শাহেদ প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নিজের বিছানা গোছায়। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে এসে স্কুলের ব্যাগ, বই, খাতা, জামা-প্যান্ট, জুতা-মোজা ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখে। প্রতিদিন পড়ালেখা শেষ করে বই, খাতা, পেন্সিল, কলম সব গুছিয়ে রাখে। বিকেলে খেলা শেষে খেলার সামগ্রীগুলো ঠিক জায়গায় রাখে। ফলে প্রয়োজনের সময় সে সবকিছু হাতের কাছে পায়। প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকে। তাই পরিবারের সবাইকে ব্যবহারের পর জিনিসগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হবে। জিনিসপত্র যথাস্থানে যত্ন সহকারে রাখলে সেগুলো টেকসই হয়। গৃহের পরিবেশ থাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। প্রয়োজনের সময় সেগুলো সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। ফলে খোঁজাখুঁজিতে অযথা সময় ও শক্তি অপচয় হয় না। এছাড়া জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে গৃহের সৌন্দর্য নষ্ট হয় ও বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা ঘটারও আশঙ্কা থাকে।

গৃহের বিভিন্ন রকম কাজের সুবিধার জন্য আমরা অনেক রকম সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ ব্যবহার করে থাকি। যেমন–

রান্না ও খাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম- হাঁড়ি, কড়াই, খুন্তি, চামচ, বঁটি, ছুরি, প্রেসার কুকার, ব্লেন্ডার, ওভেন, চুলা ইত্যাদি। এর মধ্যে যেগুলো প্রতিদিন ব্যবহার হয়, সেগুলো রান্না ঘরের তাকে হাতের কাছে রাখা ভালো। আর যেগুলো প্রতিদিন ব্যবহার হয় না, সেগুলো কেবিনেট বা উপরের দিকে রাখা হয়। খাবার পরিবেশনের জন্য প্লেট, গ্লাস, জগ, চামচ, কাঁটাচামচ, ট্রে ইত্যাদি খাবার ঘরে তাকে সাজিয়ে রাখতে পারি।

সেলাইয়ের সরঞ্জাম- এর মধ্যে প্রধান হলো সেলাই মেশিন যা আমরা ঘরের যেকোনো একটা কোনায় রেখে থাকি। সুচ, কাঁচি, ফিতা, বোতাম, সুতা, ইত্যাদি উল্লিখিত অন্যান্য উপকরণ গুলো একটা বাক্সে করে মেশিনের কাছে রাখি।

বাগান করার সরঞ্জাম- ঝাঁঝরি, পানির পাইপ, শাবল, কোদাল, দা, কাঁচি ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে একটা কোণে নির্দিষ্ট তাকে অথবা স্টোর রুমেও রাখা যায়।

লন্ড্রির সরঞ্জাম- বালতি, মগ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। এগুলো বাথ রুমে রাখা হয়। ইস্ত্রিটা ইস্ত্রির বোর্ডের সাথে রাখা যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জাম- ঝাড়ু, ঝুলঝাড়ু, ঘরমোছার সামগ্রী, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি। এগুলো আমরা স্টোর রুমের একটা কোনায় রাখতে পারি।

পোশাক-পরিচ্ছদ- দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক-পরিচ্ছদগুলো আমরা আলনা বা ওয়ার্ড্রোবে রাখি। উৎসবে পরার পোশাক বা মৌসুমি পোশাকগুলো আমরা আলমারিতে বা বাক্সে রাখি। এছাড়া জুতা, স্যান্ডেল, মোজা ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার অভ্যাস করা উচিত। এগুলো রাখার জন্য আলনার নিচের তাক বা জুতার তাক ব্যবহার করতে পারি।

পড়ালেখার উপকরণ- পড়ালেখার উপকরণগুলো যেমন বই, খাতা, কলম ইত্যাদি পড়ার টেবিলের কাছে কোনো তাকে গুছিয়ে রাখি। তাক না থাকলে টেবিলের উপরেও সেগুলো গুছিয়ে রাখতে পারি।

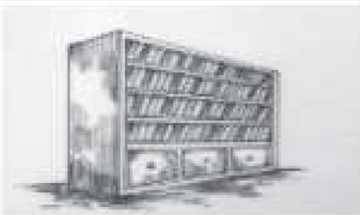
বইয়ের তাক

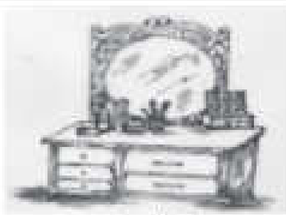
ড্রেসিং টেবিল

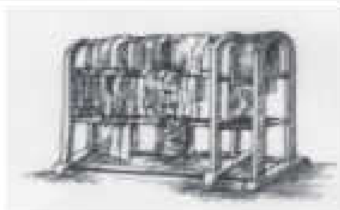
আলনা

প্রসাধন সামগ্রী- সাজসজ্জার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করি। যেমন- সাবান, শ্যাম্পু, চিরুনি, স্নো-পাউডার, কোল্ড ক্রিম, লিপস্টিক, পারফিউম, শেভিং ব্রাশ, রেজার ইত্যাদি। এগুলো ড্রেসিং টেবিল বা ড্রেসিং রুমের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলে সুবিধা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ- তুলা, ব্যান্ডেজ, ডেটল, গরম বা বরফ পানির ব্যাগ, স্পিরিট, বার্নল, ব্যথা কমার ওষুধ, অ্যান্টিসেপটিক পাউডার বা মলম ইত্যাদি। এগুলো আমরা একটা নির্দিষ্ট বাক্সে রাখি, যাকে বলে 'প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স'। এটা একটু উঁচু স্থানে রাখতে হয়। তবে তা যেন সবাই দেখতে ও জানতে পারে।

বিবিধ- বিবিধ জিনিসের মধ্যে আছে- পুরনো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি। এ জিনিসগুলো যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে, সেজন্যে কোনো বাক্সের ভিতরে রেখে দিতে পারি। যাতে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট না হয়।

কাজ– ১ প্রতিদিন তুমি যে সব জিনিস ব্যবহার করো, সেগুলো কোথায় রাখো–তার একটা তালিকা করো।

কাজ– ২ তোমার বাসার প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে কী কী থাকা দরকার সেগুলো লেখো।

পাঠ ৪- গৃহ পরিবেশ রক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনে গাছ

সুমি তার বাবার সহায়তায় বাড়ির ছোট প্রাঙ্গণে শাক সবজি ও ফলের বাগান করেছে। আর বারান্দায় টবে ফুলের গাছ লাগিয়েছে। প্রতিদিন সে গাছগুলোতে পানি দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে। নিজ হাতে শাক সবজি, ফল তুলে আনে। টাটকা শাক সবজি, ফল খেয়ে ওদের পরিবারের সবার স্বাস্থ্য ভালো ও মন প্রফুল্ল থাকে।

সুমির মতো আমরাও গৃহ ও গৃহের পরিবেশ উন্নত করার জন্য বিভিন্ন রকম গাছ লাগাতে পারি। শহরে আমরা ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দা ও ছাদে টবে বিভিন্ন রকম গাছ লাগাতে পারি। গাছ থেকে আমরা অনেক উপকার পাই। যেমন–

- গাছ আমাদের অক্সিজেন জোগায়, যা আমরা শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ে থাকি।
- শাকসবজি ও ফল গাছ পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি জোগায়।
- ফুল গাছ গৃহের শোভা বাড়ায়।
- বড় গাছ বাড়িতে ছায়া দেয়, পরিবেশকে আরামদায়ক করে।

অনেক বাড়িতে খোলা প্রাঙ্গণ থাকে। সে জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করে বাড়ির সামনের অংশে ফুলের বাগান ও পিছনের অংশে সবজি, ফলের বাগান করা যায়।

টবে ও গৃহের আঙিনায় গাছ লাগানো ও পরিচর্যা

টবে বা আঙিনায় দুইভাবে গাছ লাগানো যায়–

- বীজ পুঁতে
- চারা গাছ লাগিয়ে।

টবে ফুলের গাছ

টবে সবজির গাছ

আঙিনায় গাছ লাগানোর জন্য প্রথমে জায়গাটাকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। আঙিনা হলে আগাছা পরিষ্কার করে, কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা ও সমতল করে দিতে হবে। মাটির উর্বরতার জন্য মাটিতে গোবর বা জৈব সার মেশাতে হয়। এর পর বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়। আঙিনায় ছোট, বড় সব গাছই লাগানো যায়। এখানে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ লাগাতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন মৌসুমি শাক সবজির চাষও করা যায়।

আঙিনা না থাকলে ছোট বড় টবে বিভিন্ন সবজি, কলম করা গাছ, বিভিন্ন মৌসুমি ফুল লাগানো যায়। এই ক্ষেত্রে টবের মাঝে ছিদ্র বরাবর একটি মাটির চাড়া রাখতে হবে। তার উপর ইটের খোয়া ও শুকনা পাতা রেখে সারযুক্ত মাটি এমনভাবে ভরতে হবে যাতে টবের উপর দিকে ২ ইঞ্চি পরিমাণ খালি থাকে।

বীজ থেকে চারা গজালে নিয়মিত গাছে পানি দিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। মাঝে মাঝে চারার গোড়ার মাটি নিড়ানির সাহায্যে আলগা করে দিতে হয়। এতে মাটিতে সূর্যের আলো, বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং মাটির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়ে।

টবে লতানো গাছ

গাছের গোড়ায় কোনো আগাছা হলে, তা সাথে সাথে তুলে ফেলতে হবে। কারণ আগাছা গাছের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। অনেক সময় গাছে পোকা মাকড়ের উপদ্রব দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে ভালো গাছের জন্য প্রয়োজন–

* সতেজ চারা বা পুষ্ট বীজ
* সারযুক্ত ভালো মাটি
* আলো, বাতাস, পানি
* নিয়মিত পরিচর্যা

গৃহের আঙিনায় একটি সুন্দর বাগান

কাজ ১– টবে একটা ফল গাছ লাগানোর পদ্ধতি বর্ণনা করো।

কাজ ২– গাছের নিয়মিত পরিচর্যা বলতে তুমি কী কী করণীয় মনে করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি আনুষ্ঠানিক স্থান?

ক. খাওয়ার ঘর খ. শোবার ঘর
গ. পড়ার ঘর ঘ. সাজসজ্জার ঘর

২. আদিম মানুষের পরিবার গঠনের কারণ–

i. আশ্রয়স্থলের নিরাপত্তা
ii. একত্রে চাষাবাদের সুবিধা
iii. পারস্পরিক সহযোগিতা পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অনিতা নামকরা নার্সারি থেকে একটি মরিচের চারা কিনে আনল। তারপর মাটি ভর্তি টবে রোপণ করে তার পড়ার ঘরে রাখল। সেই সাথে মরিচ গাছের রোগবালাই দমনে কী ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় তাও জানল। অনিতা গাছে নিয়মিত পানি দিত। তারপরও গাছটির যথাযথ বৃদ্ধি হলো না এবং মরিচও ধরল না।

৩. গাছটি বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ কী?

ক. উপযুক্ত কীটনাশকের অভাব খ. পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব
গ. অপুষ্ট চারা রোপণ ঘ. টবে চারা লাগানো

৪. অনিতার গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য দরকার–

i. পর্যাপ্ত সার ব্যবহার করা
ii. টবটি বারান্দায় নিয়ে রাখা
iii. পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাইয়ানের মাকে কিছুদিন পর পর রাইয়ানের জন্য খাতা, পেন্সিল, রাবার, খেলার বল কিনে দিতে হয়। একদিন খেলার মাঠ থেকে ফিরে রাইয়ান তার ব্যাট বল জুতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে তাতে হোঁচট খেয়ে তার ছোট বোন রুপার কপাল কেটে যায়।

ক. শিশুর জীবনের প্রথম পরিবেশ কোনটি?

খ. প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বোঝায়?

গ. রাইয়ানের কোন অভ্যাসের জন্য রুপা ব্যথা পেল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাইয়ানের এ ধরনের অভ্যাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী প্রভাব ফেলে? বুঝিয়ে লেখো।

২.

১নং চিত্র

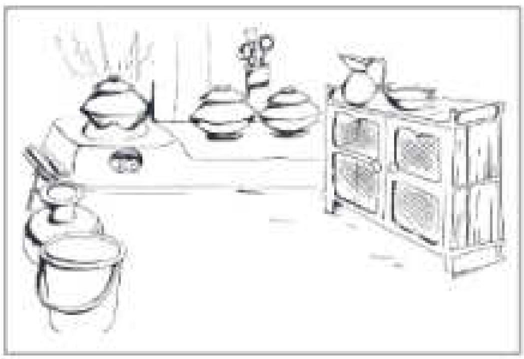

২নং চিত্র

ক. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কী করতে হয়?

খ. গৃহের অনানুষ্ঠানিক স্থান বলতে কী বোঝায়?

গ. ২নং চিত্রের গৃহ পরিবেশটি কেমন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ১নং চিত্রের গৃহ পরিবেশটি পরিবারের সদস্যদের 'সুস্থ' বিকাশের জন্য প্রধান অন্তরায়। বুঝিয়ে লেখো।

২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পাঠ ১- গৃহের অভ্যন্তরীণ স্থানের পরিচ্ছন্নতা

আমরা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। এর জন্য দরকার একটা স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ। যেখানে বাস করলে আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকবে। এই গৃহের পরিবেশকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হলে এর ভিতরের ও বাইরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি গৃহ আমাদের দিতে পারে আরাম ও সুস্থতা। আমাদের গৃহের প্রতিটি জায়গা এবং এর আনাচে-কানাচে পরিষ্কার রাখতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহ পরিবেশে মশা-মাছি পোকামাকড়ের উপদ্রব থাকে না, ফলে রোগজীবাণু সহজে ছড়াতে পারে না। দূষণমুক্ত পরিবেশে বাস করতে পারলে আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকবে।

অভ্যন্তরীণ স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : গৃহের অভ্যন্তরে আমরা বেশি সময় থাকি, নানারকম কাজ করি, বিশ্রাম নেই। সেজন্যে এর সব জায়গাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা দরকার।

অভ্যন্তরীণ স্থানে যেসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ হয়–

- ঘরের মেঝে ঝাড়ু দেওয়া, মোছা বা লেপা।
- দরজা, জানালার গ্রিল, কাঁচ পরিষ্কার করা।
- দেয়াল, সিলিং, বৈদ্যুতিক পাখা পরিষ্কার করা।
- কাপড়-চোপড় ধোওয়া।
- সিঙ্ক, বেসিন, কলতলা পরিষ্কার করা।
- আসবাবপত্র ঝাড়া, মোছা, রং করা।
- বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলা।
- বাথরুম, টয়লেট পরিষ্কার করা।
- বাড়িতে রং এবং মেরামত করা ইত্যাদি।

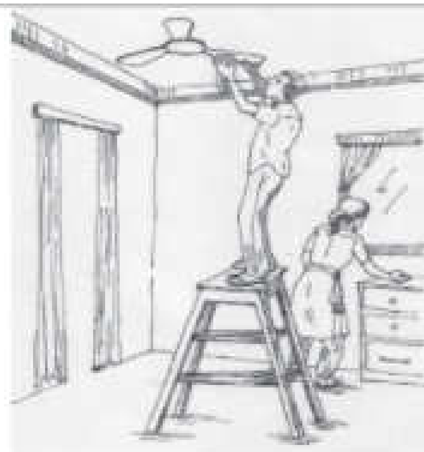

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ

কিছু কিছু পরিষ্কার করার কাজ প্রতিদিন করতে হয়। আবার কিছু কিছু কাজ সপ্তাহে, মাসে বা বছরে একবার করলেও হয়। অন্যান্য কাজের মতো গৃহ পরিষ্কার করার কাজগুলোরও একটা পরিকল্পনা করে নিতে হয়।

অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়।

২০২৫

(১) দৈনিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : প্রতিদিন সব ঘর, বারান্দা ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা বা মাটির ঘর লেপা, আসবাবপত্রের উপরিভাগ মোছা, বিছানা গোছানো, বই, খাতা গোছানো, রান্নাঘর ও অন্যান্য ঘরের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা, প্রতিদিনের ব্যবহার করা কাপড় ধোওয়া। এছাড়া কলতলা, বেসিন, সিঙ্ক, গোসলখানা, পায়খানা প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হয়। প্রতিদিনের ময়লা, আবর্জনা সরিয়ে ফেলাও দৈনিক পরিচ্ছন্নতার কাজ।

(২) সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : দেওয়াল ও সিলিং এর ঝুল ঝাড়া, দরজা-জানালার গ্রিল, কাচ ঝাড়া ও মোছা, বৈদ্যুতিক পাখা পরিষ্কার করা, বিছানার চাদর, বালিশের কভার ধোওয়া, রান্নাঘরের তাক পরিষ্কার করা, কার্পেট থাকলে তা ঝাড়া ও রোদে দেওয়া। ফ্রিজ থাকলে তার ভিতর ও বাইরে পরিষ্কার করা ইত্যাদি সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে।

(৩) বাৎসরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : আসবাবপত্র রং করা, বড় বড় আসবাবপত্র সরিয়ে মেঝে পরিষ্কার করা, বাড়ি মেরামত ও চুনকাম করা, বাক্সে বা আলমারিতে তোলা কাপড়, কাঁথা, লেপ, তোশক, কম্বল রোদে দেওয়া। এছাড়া কাঁচের বা কাঠের আলমারি বা বাক্সে তোলা কাচের প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ধোওয়া ও মোছা বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে।

যেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো অনেক ধরনের এবং যথেষ্ট কষ্টকর। তাই বাড়ির ছোট বড় সব সদস্যদের বয়স, শক্তি, দক্ষতা, অনুসারে কাজগুলো ভাগ করে দিতে হবে। ছোটরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে এ ব্যাপারে সচেতন ও যত্নশীল হয়ে গড়ে উঠবে। তারা গৃহ পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং দায়িত্ব নিতে শিখবে।

গৃহ পরিষ্কার করার সামগ্রী :

ফুল ও শলার ঝাড়ু, প্লাস্টিকের বালতি, মগ, মাটির গামলা, ব্রাশ, ঝুলঝাড়ু, মই, নারিকেলের ছোবড়া বা নাইলনের মাজুনী, নরম সুতি কাপড় বা তোয়ালে, সাবান, ভিম বা ব্লিচিং পাউডার, পুরনো খবরের কাগজ ইত্যাদি।

বিভিন্ন রকম পরিষ্কার করার সামগ্রী

কাজ-১ গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য কোন কাজগুলো তুমি করো, তার একটা তালিকা তৈরি করো।
কাজ-২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন কাজের জন্য কী কী সামগ্রী দরকার, তা চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ২- বহিরাঙ্গনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

সুস্থতা ও মানসিক তৃপ্তি বজায় রাখার জন্য গৃহের ভিতরের মতো এর বাইরের স্থানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

গৃহের বাইরের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার জন্য যে সব ব্যবস্থা থাকতে হবে–

- আঙিনায় ঝরে পড়া পাতা, শুকনা ডাল ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা।
- গৃহের চারপাশে ঝোপঝাড় না হতে দেওয়া।
- ঘাস কাটা ও আগাছা পরিষ্কার করা।
- ছাদ বা চালা পরিষ্কার রাখা।
- নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি।

বহিরাঙ্গনে বড় গাছ থাকলে, বছরে একবার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। এতে গাছের ভালো বৃদ্ধি হয়, বাড়িঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। ঘরের ছাদ বা চালা সপ্তাহে একদিন ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ঘরের ছাদে যেন পানি জমে না থাকে সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। ছাদে পানি জমে ঘরের দেয়াল, সিলিং স্যাঁতস্যাঁতে হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। টিনের চালা ফুটো হয়ে গেলে তা মেরামত করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন টিন লাগাতে হবে।

শহরাঞ্চলে নালা-নর্দমার সাহায্যে বাড়ির ময়লা পানি, তরল বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে মাটির নিচের বড় পাইপে যেয়ে পড়ে। নালা-নর্দমার উপরিভাগ খোলা থাকলে নিয়মিত এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। বাড়ির আবর্জনা, পলিথিনের ব্যাগ ইত্যাদি নালায় ফেললে পানি চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ময়লা পানি উপচে পড়ে পরিবেশকে দূষিত করবে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। লম্বা হাতওয়ালা ব্রাশ, বাঁশের চটা ইত্যাদি দিয়ে আমরা প্রতিদিন নালা-নর্দমার পানি চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখব। জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।

বাড়ির আঙিনায় কোথাও যেন বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সেজন্যে মাটিতে পানি সরে যাবার নালা তৈরি করে দিতে হবে। জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পেড়ে বংশ বিস্তার করে। ফলে ডেঙ্গুজ্বর হবার আশঙ্কা থাকে।

২০২১

অনিক মাঝে মাঝেই স্কুলে যায় না। প্রায় সারা বছরই সে সর্দি, কাশি, জ্বরে আক্রান্ত থাকে। ফলে তার মন ভালো থাকে না। কোনো কাজেই আনন্দ পায় না। বন্ধুরা একদিন ওর বাড়িতে যেয়ে দেখল, বাড়িটা খুবই স্যাঁতস্যাঁতে ও অন্ধকার। বাড়িটার আঙিনায় বড় বড় গাছের ডালপালা কাটা হয় না বলে সূর্যের আলো, বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বাড়ির পরিবেশটা স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় অনিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সুস্থ থাকতে হলে গৃহের ভিতর ও বাইরের সব পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বহিরাঙ্গন

কাজ-১ গৃহের বাইরের স্থানগুলো পরিষ্কার রাখতে তুমি তোমার পরিবারকে কীভাবে সাহায্য করতে পার?

কাজ-২ সহপাঠীরা মিলে তোমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিষ্কার করবে। কে কী কাজ করবে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতার কাজ?

ক. আসবাবপত্র রং করা
খ. বাক্সে তোলা কাচের জিনিস ধোয়া
গ. রান্না ঘরের তাক পরিষ্কার করা
ঘ. বই খাতা গোছানো

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শান্তা তার বাড়ির আঙিনায় 'মাটি সমতল করে ফুল ও সবজি বাগান করল। সে নিয়মিত বাগানের আগাছা পরিষ্কার করে ও বাগানের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

২. বাগান করার মাধ্যমে শান্তা পরিচ্ছন্নতার কোন কাজটি করে?

ক. সাপ্তাহিক
খ. অভ্যন্তরীণ
গ. বাৎসরিক
ঘ. বহিরাঙ্গন

৩. বাগান করা থেকে শান্তা যে সুবিধা পেতে পারে তা হলো–

i. বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা
ii. বাড়ির শোভাবর্ধন
iii. পুষ্টির চাহিদা পূরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বহুতল ভবনের মাঝখানে সেমিপাকা বাড়িতে শাহানা তার পরিবার নিয়ে বসবাস করে। তার বাড়ির আঙিনার চারপাশ ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। একপাশে খোলা নর্দমা উপচে তরল ময়লা আঙিনায় চলে আসে। এতে তার বাড়িতে মশা মাছির উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে।

ক. এডিস মশা কোন রোগ ছড়ায়?
খ. বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?
গ. শাহানার বাড়িতে কোন ধরনের পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শাহানার গৃহ পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের অন্তরায়–বুঝিয়ে লেখো।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনা

পাঠ ১- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা

তোমরা ইতোমধ্যে গৃহ ও এর পরিবেশ সম্পর্কে জেনেছ। আমরা সবাই চাই আমাদের গৃহটা যেন শান্তিপূর্ণ হয়, সুশৃঙ্খল হয়। আমাদের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা পূরণ এই গৃহেই হয়ে থাকে। আর ইচ্ছে বা উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হলে বিভিন্ন রকম কাজ করতে হয়। কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থাপনা দরকার হয়। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, তোমাদের বাড়িতে রোজ অনেক রকম কাজ হয়। কখনো কি ভেবে দেখেছ, কাজগুলো–

- কে বা কারা করছে?
- কেন করা হচ্ছে?
- কীভাবে করা হচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের কর। দেখবে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য যৌথভাবে কাজগুলো করছে। তারা তাদের সময়, বুদ্ধি, টাকা-পয়সা শ্রম ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহার করে কাজগুলো করছে, পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য। প্রতিটা পরিবারের অনেক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য তারা উপায় খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। প্রথমে তারা লক্ষ্য ঠিক করে কাজ করার একটা পরিকল্পনা করে। কীভাবে করবে তা চিন্তা করে। তারপর পরিবারের সদস্যরা মিলে কাজগুলো সম্পন্ন করে। সবশেষে কাজের ভালো-মন্দ ফলাফল যাচাই করে দেখে যে, কাজটাতে সফলতা এলো কি না।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, পরিবারের লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাকে এক কথায় গৃহ ব্যবস্থাপনা বলে।

গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি যা কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনা গৃহের সব কর্মকাণ্ডকে সচল রাখে।

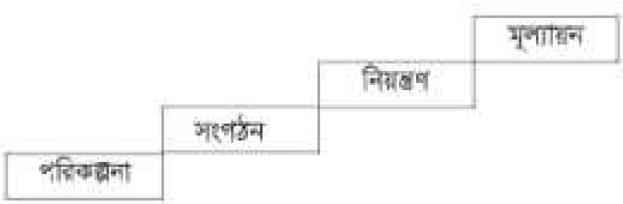

পরিকল্পনা-গৃহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রথম ধাপ পরিকল্পনা করা। যে কোনো কাজ করতে হলে আগে কাজটি কেন করা হবে, কীভাবে করা হবে, কে বা কারা করবে ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করার নামই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা করে নিলে কোন কাজ কখন করা হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

সংগঠন

বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংযোগ সাধন করা অর্থাৎ কাজ, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হলো সংগঠন।

নিয়ন্ত্রণ

পরিকল্পনা বাস্তবে কাজে পরিণত করার জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ও সংগঠনের বিভিন্ন ধারাকে কার্যকর করাই নিয়ন্ত্রণ।

মূল্যায়ন

গৃহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপের নাম মূল্যায়ন। কাজের ফলাফল ভালো না মন্দ তা যাচাই করাই মূল্যায়ন। কাজটির সফলতা বা ব্যর্থতা, মূল্যায়ন করার ফলেই বোঝা যায়। ফলে ভবিষ্যতে কাজটি সহজেই নির্ভুলভাবে করা যায়।

কাজ- ১ তোমার পরিবারের একটা লক্ষ্য হচ্ছে তোমাকে শিক্ষিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে তুমি কী কী করছ? তালিকা করো।

কাজ- ২ তোমার পরিবারে যে কজন সদস্য আছে, তারা একদিনে কে, কী কী কাজ করছে, তা লিপিবদ্ধ করো।

পাঠ ২ - গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার গুরুত্ব

পরিকল্পনার মাধ্যমেই আমরা ঠিক করে নেই, কোন কাজের পর কোনটা করব, কখন, কীভাবে করব ইত্যাদি। পরিকল্পনা করে নিলে কাজ করাটাও সহজ হয়ে যায়। কাজের পরিকল্পনাটা সব সময় লিখিতভাবে করতে হয়, যাতে মনে থাকে।

পরিকল্পিত কাজ : যে কাজ পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়, তাই পরিকল্পিত কাজ। পরিকল্পনা করে কাজ করলে, ভুল ত্রুটি কম হয় এবং সময়মতো কাজটা সম্পন্ন হয়।

পরিকল্পিত কাজের সুবিধা-

- সারাদিন কোন কাজের পর কোন কাজ করা হবে তা জানা যায়।
- সব কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা যায়।

- কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না।
- সময়, শক্তি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয়।
- যে কোনো কাজেই সফল হওয়া যায়।

কাজ- ১ সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য আগের দিন পরিকল্পনা করে তুমি কী কী কাজ কর তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অপরিকল্পিত কাজ : পরিকল্পিত কাজের বিপরীত কথাটাই হলো অপরিকল্পিত কাজ।

কল্পনা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। আজ তার অঙ্ক শ্রেণি-পরীক্ষা হলো। গতকাল স্কুল থেকে বাসায় এসে সে বন্ধুর সাথে ফোনে গল্প করেছে। সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখেছে। রাতে খাবার পর শুধু ছবি এঁকেছে। অযথা সময় নষ্ট করার ফলে পরীক্ষার জন্য সে কোনো রকম প্রস্তুতি নিতে পারেনি। ফলে দেখা গেল যে তার পরীক্ষাটা ভালো হলো না এবং ভালো নম্বরও পেলনা।

আমাদের জীবনে লক্ষ্য অনেক, তাই অনেক কাজও করতে হয়। সেজন্যই পরিকল্পনা না থাকলে আমরা সব কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারব না। অপরিকল্পিত বা অগোছালো কাজ কখনও সফলতা আনে না।

কাজ - ২ অপরিকল্পিত কাজের অসুবিধাগুলো কী তালিকা করো।
কাজ - ৩ তুমি কোন কাজগুলো পরিকল্পনা করে কর আর কোনগুলো পরিকল্পনা ছাড়া কর তার একটি তালিকা করো।

পাঠ ৩- গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

যেকোনো কাজ করার অনেকগুলো পন্থা বা উপায় থাকে। সেগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো উপায়টাকে আমরা যখন গ্রহণ করি সেটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই দরকার। এটা কাজ শুরুর আগে প্রথম পদক্ষেপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। আর যদি সিদ্ধান্তটাই ভুল হয়ে যায়, তাহলে কখনই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। সময় ও কাজের প্রয়োজনে আমাদের প্রায়ই নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

রমেশ তার পরিবারের সাথে শীতকালীন ছুটিতে কক্সবাজারে যেতে চাইল। পরিবারের সবাই আলোচনা করে তারা প্লেনের পরিবর্তে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ট্রেন এবং তারপর বাসে কক্সবাজার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা চিন্তা করে দেখল যে, প্লেনের যাতায়াত ভাড়া অনেক বেশি। তাছাড়া ট্রেনে এবং এরপর বাসে গেলে অনেক জায়গা দেখতে পাবে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবে। ফলে ভ্রমণটা অনেক আনন্দদায়ক হবে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটা ধাপেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করলে আমরা অবশ্যই সফল হব। সিদ্ধান্ত দুই রকমের হতে পারে। যথা-

(i) একক সিদ্ধান্ত

(ii) দলীয় সিদ্ধান্ত

একক সিদ্ধান্ত : ছোট সমস্যায় পড়লে বা অবস্থার পরিবর্তনে তুমি নিজেও সমাধানের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো। যাকে বলে একক সিদ্ধান্ত।

দলীয় সিদ্ধান্ত : পরিবারে এমন অনেক সমস্যা দেখা দেয়, যেগুলো কিছুটা জটিল। সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখবে তোমার মা বা বাবা, পরিবারের ছোট-বড় সব সদস্যের সাথে আলোচনা করে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যাকে বলে দলীয় সিদ্ধান্ত। দলীয় সিদ্ধান্তে অনেকের মতামত পাওয়া যায়। ফলে সমস্যা সমাধানের অনেক পথও জানা যায়। সেগুলো থেকে যেকোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কিছু ধারাবাহিক নিয়ম আছে। সেগুলো হচ্ছে–

- প্রথমে সমস্যাটা বুঝতে হবে এবং সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটা পন্থা বা উপায় খুঁজতে হবে।
- পন্থাগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।
- যে উপায় বেশি ভালো মনে হবে অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করলে সমস্যা সহজেই সমাধান করা যাবে সেটা গ্রহণ করতে হবে।

- যে উপায় বা পন্থা গ্রহণ করা হলো, সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটাকে অবশ্যই কাজে পরিণত করতে হবে। তা না হলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সেটা কোনো উপকারে আসবে না।

দলীয় সিদ্ধান্তে পরিবারের সকলের অংশগ্রহণ

কাজ–১	পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য তুমি কীভাবে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারো?
কাজ–২	বন্ধুরা মিলে দলীয় সিদ্ধান্তে তোমার স্কুলে একটা ফুলের বাগান করার পরিকল্পনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি গৃহব্যবস্থাপনার শেষ ধাপ?

ক. পরিকল্পনা   খ. নিয়ন্ত্রণ
গ. মূল্যায়ন   ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২. পরিকল্পিত কাজের সুবিধা হচ্ছে–

i. সময়মতো সব কাজ হয়ে যায়
ii. যখন যা মনে আসে তা করা যায়
iii. সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২০২৫

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

লায়লা যে কোনো পারিবারিক কাজ করার পর কাজটির সফলতা বা ব্যর্থতা যাচাই করে। তাই সকলেই তার কাজের প্রশংসা করে।

৩. লায়লা ব্যবস্থাপনার কোন ধাপটি অনুসরণ করে?

ক. পরিকল্পনা খ. মূল্যায়ন

গ. নিয়ন্ত্রণ ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪. পরিকল্পিত কাজের সুবিধা হচ্ছে–

i. পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে

ii. ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগ

iii. সময়মতো কাজ শেষ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. **i ও ii** খ. **i ও iii**

গ. **ii ও iii** ঘ. **i, ii ও iii**

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. লামিয়া ও লতিফ একই শ্রেণিতে পড়ে। লামিয়া প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী বই খাতা নিয়ে স্কুলে যায়। অপর দিকে লতিফ ক্লাস অনুযায়ী বই আনে না। ফলে লতিফ শিক্ষকের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?

খ. অপরিকল্পিত কাজ বলতে কী বোঝায়?

গ. লামিয়ার স্বভাবে ব্যবস্থাপনার কোন ধাপের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ব্যাখ্যা করো।

ঘ. লতিফের স্বভাব তার সফলতা লাভের পথে অন্তরায়। বুঝিয়ে লেখো।

২. দীপাদের স্কুল থেকে এবারে শিক্ষা সফরে সুন্দরবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ যেতে চায় বাসে কেউবা লঞ্চে। বাসে কারো কারো অসুবিধা কেউবা আবার আরামদায়কভাবে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতে চায়। শিক্ষক তাদের সময় ও অর্থের দিক চিন্তা না করে শিক্ষা সফরটা উপভোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে লঞ্চে সুন্দরবন রওনা হলো।

ক. আমাদের 'সব আশা আকাঙ্ক্ষা' কোথায় পূরণ হয়?

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

গ. শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীপা ও তার সহপাঠীরা ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে— বুঝিয়ে লেখো।

খ বিভাগ

শিশু বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক

শিশুর শিক্ষার প্রথম স্থান হলো তার পরিবার। পরিবারের প্রতিটি সদস্য শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যেকটি শিশুই আলাদা। কিন্তু বয়স অনুযায়ী কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা সকল শিশুর মধ্যেই বিরাজ করে। এগুলো জানা থাকলে পরিবারের একজন হিসেবে শিশুর প্রতি সঠিক আচরণ করা সম্ভব। কিশোর বয়সে বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে জীবন অনেক সহজ হয়। কৈশোরে সামাজিক পরিবেশে গ্রহণযোগ্য আচরণ করার মধ্য দিয়ে একটি কিশোর বা কিশোরী সকলের ভালোবাসা পেতে পারে। তার জীবন হয়ে ওঠে সফল ও আনন্দময়।

এ বিভাগ শেষে আমরা–

- পরিবার, পরিবারের কাজ, পরিবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্য জেনে তাদের সাথে সঠিক আচরণ করতে পারব।
- বয়স্কদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণের কৌশল ও পদ্ধতি প্রদর্শন করতে পারব।
- পরিবারের সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করতে পারব।
- ছোট শিশু ও প্রতিবন্ধীদেরকে তাদের প্রয়োজনের সময় সহায়তা করতে পারব।
- কৈশোরের শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ বর্ণনা করতে পারব।
- কৈশোরের বিভিন্ন আবেগের ক্ষতিকর দিক ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবার ও শিশু

পাঠ ১- পরিবার ও পরিবারের প্রকারভেদ

আমরা প্রত্যেকেই পরিবারে বসবাস করি। সাধারণত আমাদের পরিবারে থাকে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি আরও অনেকে। পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সদস্য একত্রে বাস করে যাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিয়ের মাধ্যমে এবং জন্ম সুত্রে। পরিবার হলো সমাজের মূল একক।

পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু চাহিদা থাকে। যেমন– খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ও শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে ভালোবাসা, সঙ্গলাভ, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার চাহিদা। পরিবারের ছোট সদস্যদের দরকার হয় উপযুক্ত যত্ন ও পরিচালনা। সর্বোপরি প্রয়োজন একটি নিরাপদ পরিবেশ। উপরের সবগুলো চাহিদা পূরণই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পারিবারিক বন্ধন- বাবা বা মায়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের মন খারাপ লাগে। ভাই-বোনের মধ্যে কেউ এক জন বেড়াতে গেলে একা একা লাগে। পরিবারের কারও অসুস্থতায় আমরা সবাই বিচলিত হয়ে পড়ি। বলতে পারো, কেন এমন হয়? কারণ পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিরাজ করে। এটাই পারিবারিক বন্ধন। এ বন্ধন তৈরি হয় বিয়ে, রক্তের সম্পর্ক, স্নেহ-ভালোবাসা ও একে-অপরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। পরিবারে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আন্তরিকতার সাথে পালন করা, স্নেহ-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা-সম্মান আদান-প্রদান করা, ভাই-বোন একে অপরকে সঙ্গ দেওয়া, পরস্পর ভালো-মন্দ নানা অভিজ্ঞতা ও ভাব বিনিময় করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা যায়।

পরিবারের প্রকারভেদ- গঠন অনুসারে পরিবার দুই ধরনের হয়। ১) একক পরিবার ও ২) যৌথ পরিবার।

১। **একক পরিবার-** একক পরিবার হলো ছোট পরিবার। এ ধরনের পরিবারে পৃথক একটি বাসগৃহে শুধুমাত্র মা-বাবা এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ পরিবার একক পরিবার।

২। **যৌথ পরিবার-** যৌথ পরিবার হলো বড় পরিবার। যেখানে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, মা-বাবা ও সন্তানেরা একসাথে বসবাস করে। এটাই যৌথ পরিবার। যখন এই ধরনের পরিবারে বন্ধন দৃঢ় থাকে, তখন তারা নানাভাবে একে-অপরের সহযোগিতায় আসতে পারে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে একক পরিবারের সদস্যরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে–

- একক পরিবারের সন্তানেরা তাদের দাদা-দাদি বা পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সহযোগিতা ছাড়াই বেড়ে ওঠে।
- দাদা-দাদি ও নাতি-নাতনি উভয়েই একে অপরের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়।
- মা-বাবা উভয়েই কর্মজীবী হলে সন্তানদের এমন কেউ দেখাশোনা করে যারা তাদের আত্মীয় নয়।

অনেক সময় একক পরিবারে বৃদ্ধ দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানি বা এদের মধ্যে যে কেউ একজন থাকেন। এক্ষেত্রে একক পরিবারটিও বয়স্কদের পরামর্শ, সঙ্গ, ভালোবাসা পেয়ে থাকে।

যৌথ পরিবার

একক পরিবার

কাজ-১ তোমার পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার। এই পরিবারে সদস্যদের সাথে তোমার সম্পর্ক তুলে ধরো।

কাজ-২ পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য তুমি যে কাজগুলো করতে পার তার তালিকা করো।

পাঠ ২- বিভিন্ন বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্য

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের নিচে সকলকে শিশু বলে গণ্য করা হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে– একটি সদ্যোজাত শিশু কিংবা একটি ৫ বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্য কি এক? কখনই না। তাই শিশুর বিভিন্ন বয়সের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শিশুকালকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে।

- জন্ম মুহূর্ত থেকে ২ সপ্তাহ– নবজাতক কাল
- ২ সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত– অতি শৈশব
- ২ বছর থেকে ৬ বছর পর্যন্ত– প্রারম্ভিক শৈশব
- ৬ বছর থেকে ১০/১১ বছর পর্যন্ত– মধ্য শৈশব

প্রতিটি শিশুই পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বিভিন্ন বয়সের শিশুর বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা দরকার। কারণ–

- শিশুর সাথে সঠিক আচরণ করতে পারব।
- বিভিন্ন বয়সের শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারব।
- শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে নতুন মা-বাবাকে সচেতন করতে পারব।
- যে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতায় সময়মতো চিকিৎসা করাতে পারব।
- বড় ভাই-বোন হিসেবে তাকে যত্ন ও সঙ্গ দিতে পারব।

নবজাতক কাল– যে সব শিশু জন্মের সময় লালচে বা গোলাপি বর্ণের হয়, জন্ম মুহূর্তে কাঁদে, স্বাভাবিকভাবে দুধ খেতে পারে, তারাই সুস্থ নবজাতক। নবজাতক দিনে প্রায় ১৮-২০ ঘণ্টা ঘুমায়। দু-তিন ঘণ্টা পর পর জেগে ওঠে, আহার করে, মলমূত্র ত্যাগের পর আবার ঘুমায়।

আরও কিছু লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা নবজাতকের সুস্থতা বুঝতে পারব।

- নবজাতকের প্রথম ভাষা হলো কান্না। এর মাধ্যমে শিশুর ফুসফুস সক্রিয় হয়ে ওঠে।
- ঠোঁটের কাছে আঙুল রাখলে শিশু চুষে খেতে চায়।
- শিশুর হাতের তালুতে কিছু রাখলে (পেন্সিল বা হাতের আঙুল) তা সে শক্ত করে চেপে ধরে।
- হঠাৎ কোনো শব্দ হলে শিশু চমকে ওঠে।

উপরোক্ত যেকোনো একটি অভিব্যক্তি অনুপস্থিত থাকলে নবজাতকটি যে স্বাভাবিক নয় তা বোঝা যায়। তখন দেরি না করে শিশুটিকে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

কাজ-১ তোমার ছোট ভাই বা বোনের সাথে তুমি কী ধরনের আচরণ করবে–সে সম্পর্কে লেখো।

পাঠ ৩- অতি শৈশব কাল

নবজাতক সময়ের পর বা ২ সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত কালকে অতি শৈশব কাল বলা হয়। আবার দেড় বছর থেকে যখন শিশু হাঁটতে থাকে তখন তাদেরকে 'টডলার'ও বলা হয়। এ সময়ে শিশুর বিকাশ এত দ্রুত হয় যে, কিছুদিন পরপরই পরিচিত জনের কাছেও শিশুকে অনেক বড় এবং অচেনা লাগে। জন্মের সময় যে শিশুটি বড় অসহায় ছিল সে এখন হাঁটতে পারে, লাফালাফি করতে পারে, কথা বলতে পারে, আরও কত কী!

খাদ্য, পুষ্টি, যত্ন, বাবা-মায়ের আকার আকৃতি ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন শিশুর বৃদ্ধি বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু তবুও এ বয়সে ওজন ও উচ্চতা বাড়ার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। শিশুর ওজন জন্মকালীন ওজনের দ্বিগুণ হয় ছয় মাসে। এক বছরে হয় তিনগুণ। দু'বছরে হয় চারগুণ। তিন বছরে হয় পাঁচগুণ। জন্মের সময় শিশুর যা দৈর্ঘ্য থাকে, চার-পাঁচ বছরে তা দ্বিগুণ হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে ওজন বাড়ার হার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু আমরা তাকেই বলব, যার বয়স অনুযায়ী ওজন ও উচ্চতা স্বাভাবিক, চোখ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, চামড়া, চুল চকচকে ও মসৃণ, চেহারায় আছে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির ছাপ।

ছোট্ট শিশুটির যত্নে আমাদের করণীয়-

- ক্ষুধা লাগলেই তাকে খাবার দেওয়া।
- মল-মূত্র ত্যাগ করলে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা, ভেজা অবস্থায় না রাখা।
- কান্নার সময় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার অসুবিধা দূর করা।
- অতিরিক্ত গরম বা শীতে তার যেন কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল করা।
- ভয় পেলে কোলে তুলে নেওয়া।
- আরামদায়ক ঘুমের ব্যবস্থা করা।

উপযুক্ত খাদ্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, খাদ্যের সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য দরকার স্নেহ, ভালোবাসা ও উদ্দীপনার।

শিশুর যত্নে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যে সব পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা শিশু পালন, খেলা, ভাব বিনিময়ে অংশ নেয়, সে সব শিশু অন্য শিশুদের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান হয়। তারা অধিক নিরাপত্তার মধ্যে বেড়ে ওঠে।

পরিবারের সদস্যদের সাথে শিশুর ভাব বিনিময়

> কাজ-১ অতি শৈশবে শিশুর বিকাশের জন্য কোন কোন কাজ গুরুত্বপূর্ণ, এসব তথ্যসংবলিত একটি পোস্টার তৈরি করো।

পাঠ ৪- প্রারম্ভিক শৈশব (Early Childhood)

২ বছর থেকে ৬ বছর পর্যন্ত সময় প্রারম্ভিক শৈশব বা শৈশবের প্রথম পর্যায়। এ বয়সের অন্য আর একটি নাম হলো প্রাক বিদ্যালয় শিশু বা স্কুল পূর্বের শিশু। এটা এমন একটা বয়স যখন শিশু আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কুলে পড়াশোনা শুরু করে না কিন্তু স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। আবার কোনো কোনো শিশু এ বয়সে স্কুলে যায়, তারা স্কুলে খেলা-ধুলার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরুর প্রস্তুতি নেয়। এ সময়কে খেলার বয়সও বলা হয়।

এ সময়টা শিশুর আনন্দের সময়। পৃথিবী তার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। নিজেকে, অপরকে, আশে-পাশের সবকিছুকে নিয়ে আছে হাজারো প্রশ্ন। প্রত্যেক বিষয়ে সে অনর্গল প্রশ্ন করে। সে সবকিছু শিখতে চায়। এ বয়সটা আগ্রহ ও কৌতূহলের। ধমক দিয়ে বা বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তার সকল প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে দিয়ে তাকে উৎসাহী করে তুলতে হবে। এটা কী, ওটা কী, এটা কেন হয়– এসব প্রশ্নের মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে।

কথোপকথন

আসিফ– আমি একশ গুনতে পারি। রাইয়ান– আমি একশ হাজার গুনতে পারি।

আসিফ– আমি দুইশ হাজার গুনতে পারি। রাইয়ান– আমি পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশি গুনতে পারি।

উপরের কথোপকথনটি দুইটি প্রাক বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে কথোপকথন। এ বয়সে তারা প্রচুর কথা বলতে পারে। তারা থাকে আত্মকেন্দ্রিক। এ জন্য নিজ সম্পর্কে তারা বেশি কথা বলে। কোন কোন বিষয় তার কাছে আনন্দের, তার পরিবারে কে কে আছে, তার কী কী জিনিস আছে– সে সম্পর্কে বলতে আগ্রহী হয়।

তারা সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। এভাবেই তাদের সামাজিক বিকাশ ঘটে। এ বয়সে শিশুরা অনুকরণপ্রিয় হয়। যে ধরনের কাজ তাদের সামনে করা হয়, সেভাবেই তারা অভিনয় করে, খেলে। যেমন– বাবার মতো খবরের কাগজ পড়া, মায়ের মতো সকলকে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। এ বয়সে শিশুদের জীবনে সঠিক পরিবর্তন আনার জন্য দামি খেলনা, ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা– কয়েকটি প্রাক বিদ্যালয় শিশু

পরিবারের সদস্যদের তাদের জন্য যা করণীয় তা হলো–

- তাদের সঙ্গে ঘরে ও বাইরে সুন্দরভাবে কথা বলা।
- মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা।
- বিরক্ত না হয়ে তাদের প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া।
- তাদেরকে গান, ছড়া, গল্প শোনানো।
- তাদেরকে সময় দেওয়া, তাদের সাথে খেলাধুলা করা।
- নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে পরিচিত করা বা ধারণা দেওয়া।
- নতুন কিছু দেখতে, শুনতে, করতে ও স্বাদ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ কাজগুলো ভালোভাবে যত বেশি করা হবে, ততই তার জন্য মঙ্গলজনক।

> কাজ– ১ উদাহরণসহ প্রাক বিদ্যালয় শিশুর বৈশিষ্ট্যের তালিকা করো।

পাঠ ৫- মধ্য শৈশব (Middle Childhood)

৬ বছর থেকে ১০/১১ বছর পর্যন্ত বয়সকে মধ্য শৈশব বলে ধরা হয়। এ সময়ে শিশুর শারীরিক বিকাশ ধীরগতিতে চলে। কিন্তু সামাজিক জীবনে আসে বিস্ময়কর পরিবর্তন। অধিকাংশ শিশু স্কুলে যাওয়া শুরু করে। ছকবাঁধা জীবনে এটি একটি প্রধান পরিবর্তন। এ বয়সটি দলীয়ভাবে খেলার বয়স। ছেলেরা ছেলেদের দলে এবং মেয়েরা মেয়েদের দলে খেলাধুলা করে। স্কুলে যাওয়া ও খেলাধুলার কারণে সমবয়সীদের সাথে তার ব্যাপক যোগাযোগ হয়।

এ বয়সে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি হয়। নিজের কাজ নিজে করতে পারে। খাওয়া, পোশাক পরা ইত্যাদি কাজ অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে করতে পারে। নিজের কাজের পাশাপাশি ঘরে বাইরে নানা ধরনের কাজ করতে পারে। যেমন– বাগান করা, ঘর গোছানো ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

এ বয়সে শিশুরা স্কুলে গল্প-কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, দুই চাকার সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি নানা রকম কাজ করে। এভাবে বিভিন্ন কাজে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা উদ্যমী ও পরিশ্রমী হয়। নতুন নতুন কাজে সাফল্য তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সমবয়সীদের সাথে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা করে। এ সময়ের সফলতা তার ভবিষ্যৎ সফলতার দরজা খুলে দেয়। অপরদিকে ব্যর্থতা তার মধ্যে সৃষ্টি করে হতাশা। এই হতাশা থেকে নানা রকম আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেমন– অতিরিক্ত রাগ, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলা বা ভাঙচুর করা, কাউকে আঘাত করা, বিষণ্ণতা, সামান্য কারণে কেঁদে ফেলা, স্কুলে যেতে না চাওয়া ইত্যাদি।

মধ্য শৈশবে শিশুরা দক্ষ ও পরিশ্রমী হতে শুরু করে

ভালো আচরণের জন্য বড়দের প্রশংসা শিশুর নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলে। শিশুকে যখন প্রশংসা করা হয় তখন সে বুঝতে পারে যে আচরণটি করছে তা বড়দের কাছে গ্রহণযোগ্য। এটি তার মধ্যে ভালো আচরণের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। তারা আরও ভালো কাজ করতে আগ্রহী হয়। শিশুরা চায় প্রশংসা ও ভালোবাসা। অপরদিকে যেকোনো কারণে বড়দের দেওয়া শাস্তি তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম দেয়। তারা নতুন কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কোনো কারণে পরীক্ষার ফল খারাপ হলে নিরুৎসাহিত হওয়া বা সাহস হারানো ঠিক না। এতে ভবিষ্যৎ সফলতায় বাধার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক সময় মা-বাবাও হতাশ হয়ে পড়েন এবং সন্তানদেরকে তিরস্কার বা রাগারাগি করে থাকেন। বড়দের নেতিবাচক উক্তি শিশুদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। এতে ভবিষ্যৎ সফলতায় বাধার সৃষ্টি হয়। এভাবে বাড়িতে ছোটদের ব্যর্থতায় তোমাদেরকেও সচেতন হতে হবে। তাদেরকে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

কাজ-১ ছোট ভাই বা বোনের সফলতার জন্য কীভাবে তাকে উৎসাহিত করা যায়– তার কয়েকটি উপায় লেখো।
কাজ-২ উদাহরণসহ মধ্য শৈশবের বৈশিষ্ট্যের তালিকা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতিসংঘ ঘোষিত সনদ অনুযায়ী কত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল ধরা হয়?

ক. ৬ খ. ১০
গ. ১৪ ঘ. ১৮

২. কোন বয়সে শিশুরা দক্ষ ও পরিশ্রমী হতে শুরু করে?

ক. অতি শৈশবে খ. প্রারম্ভিক শৈশবে
গ. মধ্য শৈশবে ঘ. কৈশোর কালে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

বাড়িতেই সালেহা বানুর সন্তানটির জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর পর তার বাচ্চাটি কাঁদেনি এবং তার শরীর নীল হয়ে যাচ্ছিল।

৩. সালেহার বাচ্চাটি নীল হয়ে যাচ্ছিল কারণ–

i. ফুসফুস সক্রিয় না হওয়া

ii. রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়া

iii. অক্সিজেনের অভাব হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও ররর ঘ. i, ii ও iii

৪. এ অবস্থায় সালেহার বাচ্চাটির জন্য করণীয় কী?

ক. বাচ্চাকে দ্রুত পরিষ্কার করা খ. দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা

গ. অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা ঘ. গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদের বয়স ৩ বছর। তার চাকরিজীবী মা বাসস্থান থেকে অফিস দূরে হওয়া সত্ত্বেও শ্বশুর-শাশুড়ির সাথেই থাকেন। আবিদের গোসল খাওয়া ইত্যাদি কাজ তার চাচি করে থাকেন। সারাদিন মা-বাবার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও দাদা-দাদির সাথে আনন্দ হৈ চৈ করে আবিদের দিন কেটে যায়।

ক. সমাজের মূল একক কী?

খ. একক পরিবার কাকে বলে?

গ. আবিদ কোন ধরনের পরিবারে বেড়ে উঠছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আবিদের বয়সী শিশুদের বেড়ে উঠার পেছনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

২. সাইয়ারা আগামী বছর স্কুলে ভর্তি হবে। সে সারাদিন কথা বলে। তার চারপাশের জগৎ নিয়ে মাকে সে সারাদিন হাজারো প্রশ্ন করে ব্যস্ত রাখে। কর্মব্যস্ত মা বিরক্ত না হয়ে সাইয়ারার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন।

ক. জন্মের পর নবজাতকের প্রথম ভাষা কী?

খ. সুস্থ স্বাভাবিক শিশু বলতে কী বোঝায়?

গ. সাইয়ারা শৈশবের কোন পর্যায়ে আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সাইয়ারার মায়ের ভূমিকা সাইয়ারার মতো শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়ক– বুঝিয়ে লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

ছোটদের শিষ্টাচার শিক্ষা

পাঠ ১– মানবীয় গুণাবলি

প্রতিদিন আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশী, ছোট-বড় অনেকের সাথেই ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ করতে হয়। এই ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের মাধ্যমেই শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। অপরের সুবিধা-অসুবিধা দেখা, অপরের মতামত, অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো এবং রুচিসম্মত ব্যবহারই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার সভ্যতার প্রতীক, অন্তরের সৌন্দর্য। শিষ্টাচার প্রকাশের মাধ্যমে মনের সুন্দর দিকগুলো ফুটে ওঠে।

শৈশব কাল থেকেই শিষ্টাচার চর্চা বা অভ্যাস করতে হয়। জীবনকে সুন্দর ও সাফল্যময় করতে হলে, উন্নত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই শিষ্টাচারী হতে হবে। তোমরা যদি ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শালীনতা ও আদব-কায়দা বজায় রেখে সমাজে চলো তা হলেই শিষ্টাচার প্রকাশ পাবে। তোমরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তোমাদের সভ্য, সঠিক, সুন্দরভাবে গড়ে ওঠার মধ্যেই রয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণ।

মানুষ হিসেবে যে আচরণগুলো আমরা সবাই একে অপরের কাছে আশা করি তাই মানবীয় আচরণ বা গুণাবলি। যেমন– সহযোগিতা, সহানুভূতিশীলতা, সহমর্মিতা, ধৈর্যশীলতা, নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয় ইত্যাদি। মানবীয় গুণাবলি পরিবার থেকে অর্জিত হয়। পরিবারে, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে মানবীয় গুণগুলো প্রকাশ পায়।

দলগত খেলার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলি সহজে বিকাশ লাভ করে। তোমরা যখন দলগতভাবে খেল তখন তোমাদের একে অপরকে সহযোগিতা করতে হয়। খেলার নিয়মকানুন মেনে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে হয়। দলের প্রতি বিনয়ী, সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন হতে হয়। কেউ ব্যথা পেলে সেবা করতে হয়, সহমর্মিতা দেখাতে হয়। আবার তোমরা যদি নিজ স্বার্থ কিছুটা ত্যাগ করে অন্যের উপকার করতে পার তা হলে তোমাদের উদারতা প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায় মানবীয় গুণাবলি তোমাদের চরিত্রকে উন্নত করে।

এখন আমরা সাদিয়া সম্পর্কে জানব। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সাদিয়া। তার নম্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, উদারতা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচার-ব্যবহার আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের সবাইকে মুগ্ধ করে। সে সব সময় বড়দের সালাম দেয় ও সম্মান করে, অতিথিদের সমাদর করে। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র প্রতিবেশী ও বাড়ির গৃহকর্মীর প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ও বিনয়ী। সে ছোটদের স্নেহ করে ও ভালোবাসে।

সহমর্মিতা প্রকাশ (দরিদ্রকে শীত বস্ত্র প্রদান)

সাদিয়া সহপাঠীদের সহযোগিতা করে। কখনও মিথ্যা কথা বলে না ও অন্যায় আচরণ করে না। কথা দিলে সেটা রক্ষা করে। নিজের দোষ-ত্রুটি সহজেই স্বীকার করে নেয়। তাই ছোট-বড় সবাই তাকে পছন্দ করে। সাদিয়া তার মা-বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করে।

তোমরা দেখতে পারছ সাদিয়ার মানবিক গুণের জন্য সবাই তাকে পছন্দ করছে। তার মধ্যে যদি হিংসা, বিদ্বেষ, অহমিকা, দাম্ভিকতা থাকত, সে যদি মিথ্যা কথা বলত, কথা দিয়ে সেই কথা মতো কাজ না করত নিশ্চয়ই কেউ তাকে পছন্দ করত না। তাই তোমাদের সব সময় মানবীয় গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যাতে সৃষ্টিকর্তা ও সব মানুষের প্রিয় হতে পার।

কাজ- ১ সবাই যে আচরণগুলো পছন্দ করে এবং যে আচরণগুলো পছন্দ করে না তার তালিকা করো।

পাঠ ২- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান

তোমাদের চেয়ে বয়সে যারা বড় তারাই তোমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, চাচা-চাচি, মামা-মামি সবাই তোমাদের আত্মীয়-স্বজন। এছাড়া শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশী সে যে পেশারই হোক না কেন, যারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং এটা ভদ্রতামূলক আচরণ। বড়দের আদেশ-উপদেশ মেনে চলাকেই তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বোঝায়। তোমরা যদি শ্রদ্ধাশীল হও, তাহলেই বড়রা তোমাদের ভালোবাসবে। শ্রদ্ধা হতেই ভালোবাসার জন্ম।

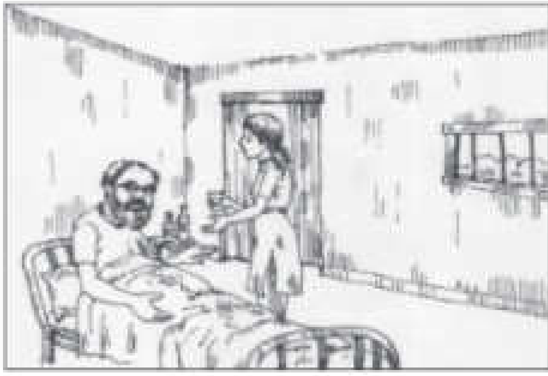

বৃদ্ধ দাদুর সেবা করা

দাদুর কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনা

তোমরা হয়তো বলতে পারো শ্রদ্ধা ও সম্মান কীভাবে দেখাব ?

শ্রদ্ধা দেখানোর উপায়

- বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখলে সালাম বা অভিবাদন জানাবে। কুশল বিনিময় করবে।
- বড়রা যখন কথা বলবেন তখন মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কোনো কথা বলবে না।
- বড়দের আদেশ উপদেশ মেনে চলবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে।
- বড়দের কোনো কথা বা কাজ তোমার পছন্দ না হলে সম্মানের সাথে তোমার মতামত জানাবে।
- বাড়িতে বৃদ্ধ দাদা-দাদি, নানা-নানি থাকলে সেবা করবে এবং সঙ্গ দিবে, গল্প করবে। কারণ তারা বয়সের কারণে নিজের কাজও নিজে করতে পারেন না, একাকিত্বে ভোগেন। এছাড়া তাদের সাথে গল্পের মাধ্যমে তোমরাও অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

তোমার বাবা-মা যেভাবে তোমাদের লালন-পালন করছেন, তোমার দাদা-দাদি/নানা-নানিও সেভাবেই তোমার বাবা-মাকে লালন-পালন করেছেন। তোমরা তাঁদের অনেক আদরের। অতি শৈশব থেকে তাঁরা তোমাদের অনেক আদর ও স্নেহ করেন, অনেক দোয়া করেন। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা যাতে কোনো দুঃখ কষ্ট না পান সে দিকে খেয়াল রাখাও তোমাদের কর্তব্য। বড়দের প্রতি তোমাদের সৌজন্যমূলক আচরণ ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁদের স্নেহ, ভালোবাসা অর্জনে তোমাদের জন্য সহায়ক হবে এবং সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে।

কাজ - ১ একজন সন্তানের তার মা-বাবাকে কীভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত তার উপর একটি পোস্টার তৈরি করো।

কাজ - ২ বৃদ্ধ দাদা-দাদি বা নানা-নানির প্রতি তোমার করণীয় সম্পর্কে লেখো।

শিক্ষকের প্রতি সম্মান- শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক জ্ঞান দান করেন আর তোমরা সেই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে গড়ে তোল। পিতা-মাতার পরেই শিক্ষকের স্থান। শিক্ষকের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই তোমাদের পাঠ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকগণ সন্তানের মতো কল্যাণ কামনা করে ছাত্রদের গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তোমরা শিক্ষকের আদর্শ মেনে চলবে। শিক্ষক যখন পাঠ দেন তখন মনোযোগী হবে। নম্র ও ভদ্র আচরণ করবে। এগুলো তোমাদের কর্তব্য।

ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিতিতে ছাত্রদের সম্মান প্রদর্শন

স্কুলের বাইরের পরিবেশে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ফাহিম ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে একটুও দেরি করে না। পাঠদানকালে সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শিক্ষকের কথা শোনে। শিক্ষকের দেওয়া শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ সে সময় মতো সম্পাদন করে। এভাবে সে শিক্ষকের নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

শুধু তাই নয়, সে শ্রেণিকক্ষ এবং স্কুলের বাইরেও শিক্ষকদের একই ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। তার এই ধরনের আচরণে সবাই তার প্রশংসা করে। সুতরাং শিক্ষকের সাথে তোমাদের সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ ও সম্মানজনক। এতে উন্নত ও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যা সকলের কাম্য।

কাজ–৩ স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে তুমি কিভাবে শিক্ষককে সম্মান দেখাবে বর্ণনা করো।

পাঠ ৩- সমবয়সীদের প্রতি আচরণ, ছোটদের প্রতি দায়িত্ব ও স্নেহ

আমরা সবাই সঙ্গপ্রিয়। পরস্পর মিলেমিশে থাকার ফলেই আমাদের জীবন সুন্দর হয়। আর এই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে সমবয়সীদের মধ্যে। কারণ সমবয়সীদের মধ্যে যেমন বয়সের মিল থাকে তেমনি মনেরও অনেক মিল থাকে। যাদের মধ্যে মনের মিল বেশি তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হয় বন্ধুত্বের। বন্ধুদের

সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করা

দলগতভাবে পড়াশোনা করছে

সাথে আমরা মনের ভাব আদান-প্রদান করি। তাই যাদের আচরণ ভালো, অন্যের ক্ষতি করে না, নিয়ম মেনে চলে, বিনয়ী, সহানুভূতিশীল ও সহমর্মিতাবোধ আছে, বন্ধু হিসেবে তারাই উত্তম। এছাড়া বন্ধু নির্বাচনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস থাকা।

রাসেল ও মিলন সহপাঠী ও ভালো বন্ধু। অন্যান্য সহপাঠী সবাই তাদের পছন্দ করে। তারা পড়াশোনা ও খেলাধুলায় সেরা। পড়াশোনায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে তবে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই, আছে আত্মবিশ্বাস। স্কুলে দুই ফুটবল টিমে তারা খেলে। তারা দু'জনেই আদর্শ নিয়ে চলে। কাজে কর্মে ধৈর্যশীল, অন্যের কষ্টে সহানুভূতি দেখায় ও সাধ্যমতো সাহায্য করে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদের এই সমস্ত গুণের জন্য সহপাঠী এবং দলের সবাই তাদের প্রতি মুগ্ধ। একদিন মিলনের দল খেলায় পরাজিত হয়। দলের অনেকেই এটা মেনে নিতে পারছে না। মিলন দলের সবাইকে নিয়ে নিজেদের দুর্বলতা, খেলার নিয়ম-নীতি নিয়ে আলোচনা করে। ফলে সবাই পরাজয় মেনে নেয়। মিলনের বিচক্ষণতাই সকলের আগ্রাসী মনোভাব দমন করে। রাসেল ও মিলনদের ক্লাসে এমন কিছু ছেলে ছিল যারা কলহপ্রিয় ও মারামারি করতে পছন্দ করে। ওরা দুই বন্ধু ঠিক করল ওদেরকে দলে খেলতে নিবে। তারা দুষ্ট ছেলেদের দুই দলে ভাগ করে নিল। খেলার নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিলো। এভাবে কিছুদিন খেলার ফলে দেখা গেল দুষ্টু ছেলেদের মন মানসিকতার অনেক উন্নতি হলো।

দেখতে পারছ তোমাদের বয়সে বন্ধুর প্রভাব অনেক বেশি। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কৈশোর বয়সে এমন অনেক চাহিদা থাকে যা মা-বাবা, শিক্ষক পূরণ করতে পারে না। সে সকল ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ।

কাজ-১ সমবয়সীদের সাথে আচরণ এ বিষয়ে তোমার নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করো।

ছোটদের প্রতি দায়িত্ব- তোমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে,আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই আছে,যারা তোমাদের চেয়ে বয়সে ছোট। তাদের প্রতি তোমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

- তোমরা ছোটদের স্নেহ ও ভালোবাসা দিবে।
- ভালো কাজের উপদেশ দিবে।
- মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে এবং মন্দ কাজের কুফল বুঝিয়ে বলবে ।
- তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার চেষ্টা করবে।
- তাদেরকে প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে। তবে তোমাদেরও ছোটদের সামনে ভালো কাজের দৃষ্টান্ত রাখতে হবে। যা দেখে ছোটরা তোমাদের অনুসরণ করবে। কারণ ছোটরা সব সময় বড়দের অনুকরণ করে শেখে।

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী নিপা মাঠে খেলতে যেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে থাকে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মালতি ও তার বান্ধবীরা নিপাকে কোলে তুলে শিক্ষকদের রুমে নিয়ে যায়, বরফ এনে পায়ে ধরে, বাতাস করে, রুমাল ভিজিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়। এতে আস্তে আস্তে নিপা সুস্থ হয়ে ওঠে। বড় আপুদের যত্ন স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতি নিপাকে মুগ্ধ করে।

মালতি দেখল ছোট একটি ছেলে কলা খেয়ে খোসাটি রাস্তায় ফেলল। মালতি ছেলেটিকে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল এবং খোসাটি ডাস্টবিনে ফেলতে বলল। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে কেউ ব্যথা পেতে পারে, এছাড়া যেখানে সেখানে ময়লা ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। ছেলেটি মালতির কথা বুঝতে পারল এবং আর কখনও এমন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল।

ছোটদের প্রতি ভালোবাসা

কাজ-২ নিপা ও মালতির কাছ থেকে তুমি কী শিখলে বলো।

পাঠ ৪- প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণ, পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা

আমরা আমাদের চারপাশে এমন কিছু মানুষ দেখি যাদের হাত-পা নাই, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না, দেহের গঠন স্বাভাবিক নয়, বুদ্ধি কম। তাদের অনেক কষ্ট। তবে তাদের এই অবস্থার জন্য কিন্তু তারা দায়ী নয়। সবাই চায় সুন্দরভাবে বাঁচতে। এই ধরনের প্রতিবন্ধীদের প্রতি তোমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

২০২১

তোমাদের সুন্দর আচরণই প্রতিবন্ধীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিবে। তাই তারা যাতে অবহেলিত না হয়, যাতে সমাজের একজন হতে পারে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারে, পড়াশোনা শিখতে পারে। সেজন্য আমাদের সবার এদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

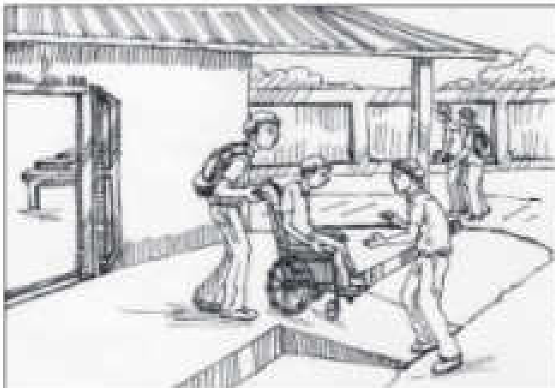

স্কুলে হুইল চেয়ারে প্রতিবন্ধী শিশু

সাদা ছড়ি হাতে অন্ধ শিশু

রতনদের স্কুলে প্রতিবন্ধী একজন ছাত্র রয়েছে। ছেলেটি শারীরিক প্রতিবন্ধী। নাম মিলন, সে হুইল চেয়ারে করে স্কুলে আসে। রতন ও তার সহপাঠীরা হুইল চেয়ার ঠেলে অনেক কষ্ট করে তাকে বারান্দায় তুলে ক্লাসে নিয়ে যায়। রতন চিন্তা করল, একটা র‍্যাম্প থাকলে তাদের এত কষ্ট হতো না। বিষয়টি নিয়ে সে শ্রেণি-শিক্ষকের সাথে আলাপ করে এবং তারা কয়েক বন্ধু মিলে মাটি দিয়ে ঢাল তৈরি করে। পরবর্তীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তার উপরে ইট বিছিয়ে সিমেন্ট করে র‍্যাম্প তৈরি করে দেয়। ফলে মিলনকে তার সহপাঠীরা সহজেই হুইল চেয়ার ঠেলে ক্লাসে নিয়ে যেতে পারে। সহপাঠী, শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাই মিলনকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়। সমাজে অনেক দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক্ ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। তোমরা সব সময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে, খেলাধুলা করবে, সঙ্গ দিবে, রাস্তা ঘাট পারাপারের সময় সাহায্য করবে। তাদের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে তারা নিজেদের অসহায় মনে না করে।

কাজ- ১ একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর প্রতি তোমার আচরণ কেমন হবে?

পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা- তোমরা সবাই মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে পরিবারে বাস কর। অনেকের পরিবারে আত্মীয়-স্বজনও থাকে। পরিবারে তোমাদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও স্নেহ, ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধন থাকে। তারপরেও পরিবারে একত্রে বাস করতে গেলে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য, মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তোমাদের উচিত এই বিষয়গুলো গোপন রাখা। কারণ বাইরে প্রকাশ পেলে পরিবারের মান, মর্যাদা ও সম্মান নষ্ট হতে পারে। এছাড়া অর্থ সংক্রান্ত ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে যদি তোমরা কিছু জেনে যাও, তাহলে সেটা নিজের মধ্যেই গোপন রাখবে। এই বিষয়গুলো বাইরের মানুষ জেনে গেলে পরিবারের নিরাপত্তা নষ্ট হয়, বিপদও ঘটার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং যে বিষয়গুলো পরিবারের বাইরের কেউ জানলে পরিবারের মান, মর্যাদা, সম্মান নষ্ট হতে পারে বা পরিবারে বিপদ আসতে পারে, সেগুলোই পরিবারের গোপন বিষয়। তোমরা একটি গল্প শুনলেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

প্রমির মা-বাবার মধ্যে একদিন মতবিরোধ হয়। প্রমি সে কথা প্রতিবেশী বান্ধবীকে বলে। বান্ধবী তার মায়ের সাথে গল্প করতে গিয়ে প্রমির মা-বাবার বিষয়টি বলে ফেলে। কয়েকদিন পর প্রমির মায়ের সাথে বান্ধবীর মায়ের দেখা হয়। বান্ধবীর মা মতবিরোধের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করে।
এতে প্রমির মা বেশ লজ্জাবোধ করেন। এই ঘটনা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ পরিবারের এমন কিছু বিষয় আছে,যা বাইরে আলোচনা করা উচিত নয়। তাই পরিবারের একান্ত বিষয়গুলো নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই থাকা আবশ্যক। তবে তোমরা অনেক সময় বন্ধুদের সাথে নিজ নিজ পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপ করো। সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে বন্ধুর কাছে যেন তোমার পরিবারের সদস্যদের মান মর্যাদা কমে না যায়। তবে পরিবারের একান্ত গোপন যে বিষয়গুলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটায় বা ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে বলে তোমার মনে হয়, সেটা তুমি মা-বাবা কিংবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য সদস্যের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পার। কারণ পরিবারের যে ঘটনাগুলো সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, সেটা খোলামেলা অলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং পরিবারের শান্তি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়। পরিবারের শান্তি,শৃঙ্খলা রক্ষায় ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তোমারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিষ্টাচারের মাধ্যমে কী প্রকাশ পায়?

ক. সৃজনশীলতা খ. দৈহিক সৌন্দর্য
গ. বুদ্ধিমত্তা ঘ. অন্তরের সৌন্দর্য

২. বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় কী?

ক. সহানুভূতি খ. সহযোগিতা করা
গ. ভালো ব্যবহার ঘ. পারস্পরিক বিশ্বাস

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রনি তার বন্ধুদের সাথে খেলা করছে। দুইটি দুষ্ট ছেলে খেলতে চাইলে কেউ নিতে চাইল না। কিন্তু রনি বলল আজ আমি খেলা দেখি আর ওদের দুইজনকে খেলায় নাও। রনি তাদের বলেছিল খেলার নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

৩. রনির এ মনোভাবে কিসের প্রকাশ ঘটে?

ক. স্বার্থত্যাগ খ. সহানুভূতিশীলতা
গ. ন্যায়বোধ ঘ. আদর্শবোধ

৪. দুষ্ট ছেলেদের মানসিকতায় যে পরিবর্তন ঘটতে পারে–

i. হিংসা বিদ্বেষ দূর হওয়া
ii. নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটা
iii. সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ৬ষ্ঠ শ্রেণির কনক যথাসময়ে ক্লাসে আসে। ক্লাস শুরু হলে কনক প্রথম সারিতে বসে ক্লাস করছে। কিছুক্ষণ পর সাহিলা ক্লাসে ঢুকে দেখে প্রথম সারির বেঞ্চে জায়গা নেই। তখন সে কনকের ব্যাগটি ২য় সারির বেঞ্চে রেখে কনককে যেতে বলে। কনক প্রথমে অসন্তুষ্ট হলেও শ্রেণিতে সমস্যা সৃষ্টি হবে ভেবে ২য় সারিতে চলে যায়। শ্রেণি-শিক্ষক বিষয়টি লক্ষ করেন এবং বলেন, প্রত্যেকের পড়ালেখার সাথে সাথে উন্নত মানবীয় গুণাবলির অধিকারী হওয়া উচিত।

ক. মানবীয় আচরণ কাকে বলে?

খ. দলগত খেলার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলির সহজে বিকাশ লাভ করে কেন?

গ. কনকের ব্যবহারে কোন ধরনের শিক্ষার প্রভাব দেখা যায়– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শিক্ষকের বক্তব্যের আলোকে সাহিদার ব্যবহারকে মূল্যায়ন করো।

২. নিচের চিত্রটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. মানুষ গড়ার কারিগর কে?

খ. বড়দের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়– বুঝিয়ে লেখো।

গ. চিত্রে নির্দেশিত বালকটির আচরণ কোন ধরনের শিষ্টাচারকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বালকটির এই আচরণ সমাজে সকলের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক– আলোচনা করো।

২০২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৈশোরকালীন বিকাশ

পাঠ ১– শারীরিক বিকাশ

সাধারণত ১০/১১ বছর বা শৈশবের শেষ পর্যায়ের পর থেকে প্রাপ্তবয়সের পূর্ব অর্থাৎ ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত কৈশোর কাল। এ বয়সকে বয়ঃসন্ধিক্ষণও বলা হয়ে থাকে।

কৈশোরে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়সে যাওয়ার জন্য ছেলে-মেয়েদের শরীরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তনের সময়কাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। শারীরিক বিকাশ বলতে দেহের পরিবর্তন ও আকার-আকৃতির বৃদ্ধিকে বোঝায়। শারীরিক পরিবর্তনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা সবার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এ সময় বছরে উচ্চতা ৭ থেকে ১৪/১৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত (৩ থেকে ৫/৬ ইঞ্চি পর্যন্ত) বাড়তে পারে। সাধারণত মেয়েরা ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত এবং ছেলেরা ২০/২১ বছর পর্যন্ত উচ্চতায় বাড়তে থাকে। এ বয়সে তাদের ওজন বাড়লেও উচ্চতা বাড়ার জন্য তাদেরকে ক্ষীণকায় দেখায়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন হয়, ক্রমে ক্রমে বেড়ে শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্কের আকার ধারণ করে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যার মাধ্যমে ছেলে এবং মেয়ে আলাদাভাবে চেনা যায়। ছেলেদের গোঁফ, দাড়ি উঠতে শুরু করে। গলার স্বর পরিবর্তন হয়। শুরুতে এটা ভাঙা ভাঙা হয়ে স্বর মোটা হয়।

মেয়েদের প্রতি ২৮ দিন অন্তর অন্তর ঋতুস্রাব হয়। এটি ৩ থেকে ৫ দিন, কারো কারো ক্ষেত্রে ৭ বা তার বেশি দিন চলতে পারে। আগে থেকে জানা না থাকলে এ পরিবর্তনে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। শারীরিক এই পরিবর্তন কারও কারও ক্ষেত্রে কৈশোরকাল শুরুর সাথে সাথে না হয়ে ২/১ বছর আগে বা পরেও শুরু হতে পারে। এতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। হঠাৎ করে এ বয়সে যে পরিবর্তন হয়, তা জীবনের স্বাভাবিক চক্র।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিশোর

বয়ঃসন্ধিক্ষণে কয়েকটি কিশোরী

কাজ- ১   বিগত ১ বছর সময়ে তোমার শারীরিক পরিবর্তনগুলো ছকে সাজাও।

সময়কাল	ওজন	উচ্চতা	চেহারা	অন্যান্য
১ বছর পূর্বে				
বর্তমান বছরে				

পাঠ ২- কৈশোরের মানসিক বিকাশ

'মন' শব্দটি থেকে মানসিক শব্দটি এসেছে। শিশুরা উচ্চতায় বাড়ে, ওজনে বাড়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা কথা বলতে শেখে, মনে রাখতে পারে। আস্তে আস্তে দিন-রাত্রির পার্থক্য বোঝে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব কত তা বুঝতে পারে। আমাদের বুদ্ধি আছে বলেই আমরা কাজ করতে পারি। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি। এগুলো সবই মানসিক ক্ষমতা বা মানসিক বিকাশ। মানসিক বিকাশ বলতে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, ভাষার প্রকাশ, চিন্তাশক্তি, বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অধিক ক্ষমতা অর্জন বোঝায়।

কৈশোরে ছেলেমেয়েরা চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করাই মানসিক বিকাশের পরিণত ধাপ, যা কৈশোর কালের ছেলেমেয়েরা অর্জন করে। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা বিমূর্ত ধারণা অর্থাৎ যেগুলো দেখা যায় না, সেগুলো বুঝতে পারে। যেমন– সততা, সাহসিকতা, মায়া-মমতা ইত্যাদি। যে ঘটনা বা বিষয়টি সামনে উপস্থিত নেই, কাগজে কলমে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে। যেমন– জ্যামিতির সমস্যা (সম্পাদ্য বা উপপাদ্য ইত্যাদি)। যুক্তি দিয়ে মতামত দিতে পারে। তাদের চিন্তা ও মনোযোগ বাড়ে। মনে রাখার ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, যুক্তি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতা যার যত বেশি সে জীবনে তত বেশি এগিয়ে যেতে পারে। পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে।

কৈশোরে মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোর কিছু উপায়-

- পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বেশি বেশি বিভিন্ন ধরনের ভালো বই পড়া।
- কৌতূহল মেটানোর জন্য প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।
- আগ্রহ নিয়ে কোনো কিছু শোনা এবং বোঝা।
- মনে রাখার জন্য পরিষ্কারভাবে দেখা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- মুখস্থ করতে হলে বিষয়বস্তু আগে বুঝে নেওয়া।
- নিজে বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক বা বয়স্কদের কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়া।
- অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করা ও ধারণার বিনিময় করা।
- বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করা।
- হাতে কলমে পরীক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ থাকলে তা করা।
- দলীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজের করণীয় বুঝে নেওয়া।
- আমাদের চারপাশের কোথায় কী ঘটছে তা জানার আগ্রহ থাকা ও জানা।

এভাবে চেষ্টা করলে তোমরা তোমাদের মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করতে পারবে। তোমাদের সকলের জানা দরকার যে, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকের বিকাশ ছাড়া শিশু তথা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

দলীয় আলোচনায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়

মানসিক ক্ষমতা বাড়ানোর একটি সহজ উপায়- ক্লাসে মনোযোগী হওয়া

কাজ- ১ তোমার মানসিক বিকাশকে নির্দেশ করে এমন কয়েকটি দক্ষতার তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩- কৈশোরের আবেগ

আনন্দ রাগ, ভয়, ভালোবাসা, হাসি, কান্না আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী, যার নাম আবেগ। আবেগ ছাড়া মানুষ হয় না। রোবটের সাথে মানুষের পার্থক্য এখানেই। রোবট মেশিনে তৈরি। মানুষের মতো সে সব পারে কিন্তু কোনো ঘটনায় হাসতে পারে না, ভয় পেয়ে পালাতে পারে না, রাগ করে চিৎকার করে না। বাইরের কোনো ঘটনা যখন আমাদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখন আমরা হাসি, কাঁদি, ভয় পাই, ঈর্ষা করি, রেগে যাই– এগুলোই আবেগ।

আবেগের ধরন

আবেগের সময় দেহ, মন ও আচরণের পরিবর্তন হয়। ভয় পেলে আমাদের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, টেনশনে বুকের ঢিপ ঢিপ বেড়ে যায়, রাগে চোখ লাল হয়ে যায়, আনন্দে আমরা হাসি, কোনো দুঃখের ঘটনায় আমাদের কান্না পায়– এসবই আবেগের প্রকাশ। আবেগের দুটি ধরন আছে। যে আবেগ আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে যেমন– সুখ, আনন্দ, হাসি, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি। এ এরকম পরিবেশ আমরা চাই। এইগুলো ইতিবাচক আবেগ। অপরদিকে রাগ, ভয়, দুঃখ, ঈর্ষা ইত্যাদি আমরা পছন্দ করি না, এগুলো দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই আবেগ হলো নেতিবাচক আবেগ।

আবেগের ক্ষতিকর দিক

অতিরিক্ত আবেগ আমাদের অনেক ক্ষতি করে। আবেগের কারণে নিজের প্রকাশভঙ্গি চেহারা পরিবর্তন হয়। রাগের সময় চোখ বড় হয়ে যায়, মুখ খিঁচে যায়, হিংস্র পশুর মতো দেখা যায়। অতিরিক্ত রাগে আচরণের পরিবর্তন হয়। অনেকে রাগে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে, ভেঙে ফেলে, অন্যকে আঘাত করে ইত্যাদি। কোনো দুঃখজনক ঘটনায় আমাদের মন খারাপ হয়, পড়াশোনায় মনোযোগ আসে না, আমরা কাঁদি, খাওয়া বন্ধ রাখি। ভয় পেলে আমাদের অস্থিরতা বাড়ে, স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারি না, কথা বলতে তোতলাতে হয়, ঘাম হয়, হাত-পা কাঁপে। এগুলো সবই শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত আবেগ আমাদের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে। আমাদের আচরণ হয় ভয়াবহ। সেখানে যুক্তি লোপ পায়।

কৈশোরে আবেগের আধিক্য থাকে। দৈহিক পরিবর্তনের জন্য আবেগের অসমতা দেখা যায়। নানা রকম দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা কাজ করে। তোমার পরিবারের সদস্যদের আচরণে তোমার অনেক সময় অভিমান হয়, রাগ হয়। এগুলো এ বয়সের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এগুলো আমাদের অনেক ক্ষতি করে।

অনেক সময় মন খারাপ থাকলে বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া যায় না, ঘুম আসে না, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, দৈনিক কাজে বাধা আসে। এ কারণে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়- সন্ধ্যায় টিভি দেখছিল অনিক। বাবা হঠাৎ টিভি বন্ধ করে দিলেন। বাবা রেগে গিয়ে বললেন, ভালো না লাগলে তার লেখাপড়ার দরকার নেই। বাবার কথায় তার খুব রাগ হলো। বই খাতা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু সে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। সে যুক্তি দিয়ে ভাবল– বাবা তো তার ভালোর জন্যই বলেছে। সন্ধ্যায় পড়ার সময় সে টিভি না দেখলেই পারত।

উপরের ঘটনায় অনিক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করল, সে ঘটনার ভালো দিকটা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করল। এভাবে তোমরাও অতিরিক্ত আবেগ বা নেতিবাচক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস করতে পার। আবেগ নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়গুলো–

- যেকোনো ঘটনার ভালো দিকটা খুঁজে পেতে শেখা।
- জটিল অবস্থা মেনে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা।
- হতাশাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।
- দলগতভাবে কোনো কাজে বা খেলাধুলায় অংশ নেওয়া।
- যেসব বিষয়ে রাগ হয়, ভয় হয়, সেগুলো যেন তৈরি না হয়, তার চেষ্টা করা ও সে সব ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া।
- মা-বাবা, বন্ধুদের সাথে নিজেদের সমস্যা খোলামেলাভাবে আলোচনা করা।

দুঃখজনক ঘটনায় আমাদের মন খারাপ হয়

কাজ-১ গত কিছুদিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া আবেগজনিত কোনো ঘটনার বিবরণ দাও। এতে তোমার প্রতিক্রিয়া কীরূপ ছিল? তোমার প্রতিক্রিয়া সঠিক না ভুল ছিল– তা যুক্তি সহকারে লেখো।

পাঠ ৪- কৈশোরের সামাজিক বিকাশ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের আচরণ বদলায়। আমাদের চারপাশের মানুষ আমাদের কাছে বয়সানুযায়ী সঠিক আচরণ আশা করে। সামাজিক বিকাশ হলো বয়সানুযায়ী আচরণ করতে শেখা। যেমন- সকলের সাথে মেলামেশা করা। সমবয়সীদের সাথে খেলা, বয়স্কদের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি। একে অপরকে সাহায্য করা, সহানুভূতি দেখানো, ভাগাভাগি করতে শেখা, ভালো কাজে অংশগ্রহণ করা, নিয়ম মেনে চলতে শেখা ইত্যাদি সবই গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণের মধ্যে পড়ে। অপরপক্ষে যেগুলো গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণের মধ্যে পড়ে না সেগুলো হলো- ঝগড়া করা, মারামারি করা বা আক্রমণধর্মী আচরণ করা, গালিগালাজ করা, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা বা স্বার্থপরতা ইত্যাদি।

কৈশোরে পরিবারের বাইরে সামাজিক পরিবেশ হলো- স্কুলের সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধু দল

কৈশোরে সমবয়সী দলের আচরণ ঐ বয়সের ছেলে-মেয়েদের আচরণে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ সময়ে পরিবারের বাইরে অন্যতম সামাজিক পরিবেশ হলো, স্কুলের সহপাঠী ও প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা। কৈশোরে ছেলেমেয়েরা দলের প্রতি অনুগত থাকে, দলের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গী দলের কাছে সে তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। ব্যক্তিগত গোপন বিষয়গুলো পরিবারের চেয়ে বন্ধুদের কাছে বলতে পছন্দ করে। এভাবে কয়েকজনকে নিয়ে একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু দল তৈরি হয়। কৈশোরে বন্ধুদের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্যে অনেক ভালো আচরণ গড়ে উঠতে পারে। বন্ধু দল যে আচরণ পছন্দ করে সেই আচরণ তারা করতে আগ্রহী হয়। যেমন- পড়াশোনায় প্রতিযোগিতা করা, শিক্ষকের নির্দেশ মানা, একসাথে খেলাধুলা করা ইত্যাদি।

কৈশোরে ভালো দলে মিশে ছেলেমেয়েরা কী কী শেখে?

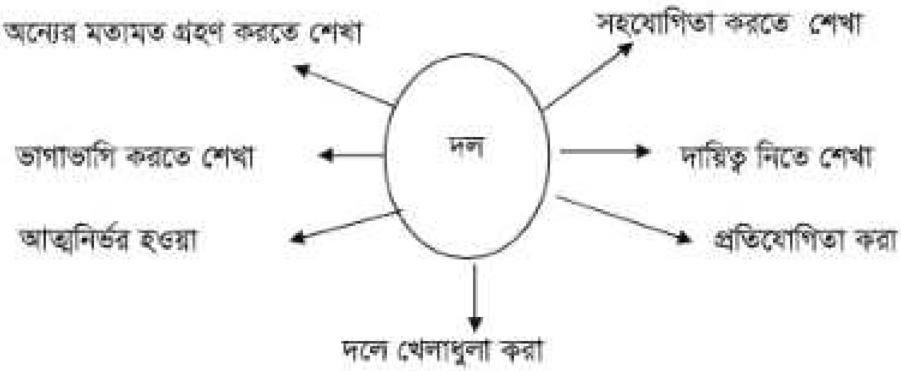

আবার বন্ধু দলের উৎসাহে তারা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও ভয় পায় না। যেমন– পরীক্ষামূলকভাবে বিড়ি, সিগারেট পান, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, স্কুল পালানো, বয়স্কদের বিরোধিতা করা ইত্যাদি। যদি কেউ আচরণগুলো না করে তবে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়, ঐ দলে থাকতে হলে ঐ আচরণগুলো মেনে নিতে তাকে বাধ্য করা হয়। এজন্য কৈশোরে বন্ধু নির্বাচনে অনেক সাবধান হতে হয়।

এবার জেনে নাও কৈশোরে সামাজিক হওয়ার জন্য কী কী করণীয়–

- সকলের সাথে কুশল বিনিময় করা
- একা একা নিজেকে গুটিয়ে না রাখা
- বিভিন্ন কাজে অংশ নেওয়া, খেলাধুলায় অংশ নেওয়া
- সকলের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করা
- বয়স্কদের সম্মান করা, তাদের নির্দেশ মেনে চলা
- ছোটদের আদর, স্নেহ করা।

কাজ- ১ তুমি যে বন্ধু দলে মেলামেশা কর, সেটিকে ভালো দল বলা যায় কি? যুক্তি দেখাও। এ দলে মিশে তুমি কী কী আচরণ শিখেছ, তা লেখো।

কাজ- ২ তোমার পরিচিত কোনো খারাপ দল সম্পর্কে লেখো। তারা কী ধরনের কাজ করে এবং তাদের জন্য তোমার পরামর্শ লেখো।

পাঠ ৫- কৈশোরের নৈতিক বিকাশ

নৈতিকতা বলতে আমরা সামাজিক ও ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করাকে বুঝি। এখানে ভালো বা খারাপ কাজের জন্য নিজেকেই দায়ী করা হয়। ভালো কাজ করলে যেমন মনে তৃপ্তি আসে, খারাপ কাজ করলে তেমনি নিজের কাছে অনুশোচনা হয়। সত্য বললে ভালো লাগে, মিথ্যা বললে অপরাধবোধ হয়। অর্থাৎ নৈতিকতা হলো নিজের আচরণকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা।

মানুষের জীবনে নৈতিকতা হঠাৎ করে আসে না। নৈতিকতার বিকাশে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। শিশু অবস্থায় পরিবার থেকে ভুল ও সঠিক আচরণের ধারণা তৈরি হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যে কাজ করতে নিষেধ করেন, সেটা খারাপ কাজ এবং যে কাজ করলে খুশি হন বা প্রশংসা করেন, সেটা ভালো কাজ। এভাবে ভালো ও মন্দ কাজের ধারণা তৈরি হয়। নৈতিক বিকাশের প্রথম দিকে শিশু শাস্তির ভয়ে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকে। শিশু কালের নৈতিকতাকে অনেকটা বাধ্যতামূলক নৈতিকতা বলা হয়। কিন্তু কৈশোরে ভালো ও মন্দের নিজস্ব ধারণা তৈরি হয়। এ বয়সে ভয়ভীতির কারণে তারা ভালো কাজ করে না বরং ভালো কাজ নিজের ইচ্ছেতেই করে। যুক্তি দিয়ে কাজটি কেন ভালো বা কাজটি কেন খারাপ- তা বিচার করার ক্ষমতা হয়। যারা নীতিবান হয়, তাদের মধ্যে খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনা হয়। আবার অন্যের সামনে লজ্জা পেতে হবে জেনেও খারাপ কাজ থেকে অনেকে বিরত থাকে।

নৈতিকতা বিকাশে নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। ছোটবেলা থেকে নিয়মমতো চলার মধ্য দিয়ে আমরা ভালো অভ্যাস তৈরি করতে পারি। নিয়ম মানার মধ্য দিয়ে কোনটি করা উচিত, কোনটি করা উচিত নয়- তা জানা যায়। বাড়িতে মা-বাবা, স্কুলে শিক্ষকেরা তোমাদেরকে নিয়মনীতি মেনে চলতে অনেক সাহায্য করেন। তাদের আদেশ, নিষেধ তোমাদের ভালো অভ্যাস তৈরি করতে, অন্যায় আচরণ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। কোনো কাজ কেন ভালো বা কেন খারাপ- শিক্ষকেরা এটা বুঝিয়ে দিলে সঠিক আচরণ করা সহজ হয়। কৈশোরে শারীরিক শাস্তি ছেলেমেয়েদের মনে বিরোধ জাগিয়ে তোলে। ছেলেমেয়েরা যখন জানে, তাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে অনেক সময় নিয়ম ভঙ্গ করার ঝোঁক বেশি হয়। এ বয়সে ভালো কাজের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশংসা তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে।

কৈশোরে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা তার আচরণে প্রভাব ফেলে। অনেক সময় খারাপ আচরণ বন্ধুদলে সমাদৃত হয়। আবার দলীয় সদস্যদের খারাপ আচরণ লক্ষ করে তারাও খারাপ কাজ করতে শেখে। দলে নিজের মর্যাদা রাখার জন্য এ ধরনের আচরণ খারাপ জেনেও করে। এজন্য কৈশোরে ও কী ধরনের বন্ধুর সাথে মেলামেশা করছে – সেটা জানা খুবই জরুরি।

এসো কৈশোরের কিছু খারাপ আচরণ সম্পর্কে জানি এবং এগুলো থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকি।

গৃহে খারাপ আচরণ	বিদ্যালয়ে খারাপ আচরণ
• ভাই-বোন একে অপরের সাথে ঝগড়া ও মারামারি করা। • বয়স্কদের সাথে কড়া সুরে কথা বলা। • দৈনন্দিন কাজ নিয়ে গাফিলতি করা। • দায়িত্ব উপেক্ষা করা। • মিথ্যা বলা। • অন্যকে দোষারোপ করা। • কারো জিনিস নষ্ট করা, চুরি করা।	• সহপাঠীদের কিছু চুরি করা। • মিথ্যা বলা। • ধোঁকা দেওয়া বা ঠকানো। • ঠাট্টা করে অন্যকে বিরক্ত করা। • সহপাঠীর সাথে মারামারি করা, গালি দেওয়া। • স্কুলের জিনিস নষ্ট করা। • স্কুল পালানো। • ধূমপান অথবা মাদকদ্রব্য সেবন করা।

কাজ-১ তোমার গৃহে তুমি কী কী ভালো আচরণ করো, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মেয়েরা কত বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতায় বাড়ে?

ক. ১৮/১৯ খ. ২০/২১
গ. ২২/২৩ ঘ. ২৪/২৫

২. কোনটি নেতিবাচক আবেগ?

ক. ভালোবাসা খ. হাসি
গ. দুঃখ ঘ. স্নেহ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

আবিরের বয়স ১৩ বছর। তার মা লক্ষ করলেন কেনাকাটা করতে গেলে আবির টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে পারে না। কোনো জিনিসের ওজন বুঝতে পারে না। তার পাঠ্য বিষয়গুলো সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে না। আবার পড়া ভালোভাবে মনেও রাখতে পারে না।

৩. আবিরের কোন ধরনের বিকাশ ভালোভাবে হয়নি?

ক. শারীরিক খ. মানসিক
গ. সামাজিক ঘ. নৈতিক

৪. পড়াশোনায় ভালো করার জন্য আবিরের দরকার–

i. মুখস্থ করার আগে বুঝে নেওয়া
ii. পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বই পড়া
iii. পরিষ্কারভাবে দেখা ও মনোযোগ দিয়ে শোনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাগীব এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। ক্লাসে সহপাঠীদের বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, দলীয় কাজে সহযোগিতা করা, বন্ধুদের বিপদে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে রাগীব সবার আগে এগিয়ে আসে। এ কারণে ক্লাসে সবাই তাকে পছন্দ করে।

ক. ছেলেরা কত বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতায় বাড়ে?

খ. মানসিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়?

গ. রাগীবের আচরণে কোন ধরনের বিকাশ লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বিভিন্ন দলে মিলে কাজ করার মাধ্যমে রাগীবের মতো চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় এ বিষয়ে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. সাজু এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। কিছুদিন ধরে তার মা লক্ষ করছেন, সে ছোট বোনের সাথে সারাদিন ঝগড়া মারামারি করে। পড়তে বসতে বললে রেগে যায়। জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি শুরু করে।

ক. কৈশোর কালের বয়সসীমা কত?

খ. নৈতিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়?

গ. সাজুর আচরণে কিসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সাজুর বয়সী কিশোর-কিশোরীরা কিভাবে এ ধরনের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে বুঝিয়ে লেখো।

সপ্তম অধ্যায়

কৈশোরকালীন পরিবর্তন ও নিজের নিরাপত্তা রক্ষা

পাঠ ১- কৈশোরকালীন পরিবর্তনে ব্যক্তিগত সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা

বয়ঃসন্ধিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে দ্রুত শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহ, মন ও আচরণেরও পরিবর্তন হয়। এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করা ও মানিয়ে নেওয়া হলে এই সময়টি সহজভাবে অতিবাহিত করা যায়। এ সময় দেহের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। পুষ্টিমান সম্পন্ন পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। সহজেই ক্লান্তি বোধ হয়। এ জন্য এ সময় সব রকম খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে। মেয়েদের এ বয়সে রক্তাল্পতা হতে পারে। লৌহজাতীয় খাবার রক্তাল্পতা দূর করতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিবর্তন বা ঋতুস্রাব শুরুর প্রথমদিকে অনেকের পেটে ব্যথা, মাথা ধরা, পিঠে ব্যথা ইত্যাদি বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এগুলো খুব স্বাভাবিক। তবে অতিরিক্ত অসুবিধা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে খেলাধুলাসহ সব কাজই করা যায় তবে ভারী জিনিস তোলা, বহন করা বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

কৈশোরে শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ছেলে মেয়ে উভয়েরই মধ্যে কিছু আচরণগত পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। দৈহিক পরিবর্তনের কারণে এই বয়সে ছেলে মেয়েরা অনেক সময় চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এ ব্যাপারে শিক্ষক, মা-বাবা, বড় ভাই-বোন অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণের কাছ থেকে শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিলে সহজেই শারীরিক ও মানসিকভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব।

সুপ্তি এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে। সে খালার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করে। এ বয়সের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু খোলামেলা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। কেমন একটা দ্বিধা, সংকোচ তার মধ্যে কাজ করে। এটা বয়ঃসন্ধিক্ষণের একটি সাধারণ ঘটনা। সুপ্তির মতো অনেকেই বাবা-মাকে বা বড়দের কাছে সমস্যা নিয়ে খোলামেলা প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে যে, এই সময়ের যেকোনো সমস্যায় মা-বাবা, বড় ভাই-বোন, শিক্ষক বা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তির পরামর্শই সকল দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে।

পরিচ্ছন্নতা

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ জরুরি। শারীরিক পরিচ্ছন্নতায় মনও প্রফুল্ল থাকে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে ত্বকের নিচে বগলের গ্রন্থি থেকে বেশি ঘাম নিঃসরণ হয়। এজন্য নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার পোশাক পরা উচিত।

মেয়েদের ঋতুস্রাবের সময় করণীয়-

- পরিষ্কার কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা।
- কাপড় ব্যবহার করলে সেটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে রোদে শুকানো।
- কাপড় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায় না রাখা, এতে রোগ জীবাণু সংক্রমণের আশংকা থাকে।
- ব্যবহৃত কাপড় বা ন্যাপকিন ভিজে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে ফেলা। বেশিক্ষণ ভেজা অবস্থায় থাকলে নানা রকম সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।
- ব্যবহৃত কাপড় বা ন্যাপকিন কাগজে জড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলা।

কাজ-১ কৈশোরে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার জন্য কী কী করবে- তার একটি তালিকা করো।

পাঠ ২- নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করতে শেখা

সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য দরকার নিরাপদ পরিবেশ। এর অভাবে ছেলে-মেয়েদের প্রায়ই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। একটু সতর্ক থাকলেই আমরা এসব বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি।

আমরা অনেক সময় খবরের কাগজে ছেলেমেয়েদের হারানো খবর, বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও বিপদে পড়ার খবর জানতে পারি। এর মধ্যে বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোরদের দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাওয়ার খবর অন্যতম। সেখানে তাদেরকে দিয়ে গৃহের কাজ থেকে শুরু করে উটের জকি, মেষ চরানো, নানা ধরনের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয়। একটি অপরাধী চক্র ছোট ছেলে-মেয়েদের বিদেশে বিক্রি করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এদের থেকে আমাদের প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে।

অনেক সময় অপরিচিত ব্যক্তি তোমার আত্মীয় সেজে এমনভাবে কথা বলতে পারে যে, তাদের প্রলোভনে তোমাদেরও ভুল হয়ে যায়। এজন্য স্কুলে যাতায়াত, অন্যান্য চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকা দরকার। তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্য নিচের বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরি-

- বাবা-মার অনুমতি ছাড়া দূরে কোথাও একা একা না যাওয়া।
- অপরিচিত কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।
- অপরিচিতদের কাছ থেকে খাবার না খাওয়া।
- অপরিচিতদের কাছ থেকে কোনো জিনিস না নেওয়া।
- কোনো রকম প্রলোভনে আকৃষ্ট না হওয়া।

অনেক সময় বাবা-মাকে বিদেশে ভালো চাকরির বা অর্থের লোভ দেখিয়ে কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে কিশোর-কিশোরীকে তারা পাচার করে ফেলে। পরিবার থেকে তারা হয় চির বিচ্ছিন্ন। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তোমাদের মা-বাবা, প্রতিবেশী, ছোট ভাইবোন এবং বন্ধুরা যেন এসব বিষয়ে সজাগ থাকে সে জন্য তোমরা তাদেরকে সতর্ক করবে।

২০১৮

আমরা অনেক সময় বাজারে কেনাকাটার জন্য যাই। ঈদ, পূজা বা বিভিন্ন উৎসবের আগে বাজারে প্রচুর ভিড় থাকে। এই ভিড়ের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে খারাপ স্পর্শ বা হাত দেওয়া। বাড়িতে কোনো পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি কোনো মেয়েকে একা পেলে কিংবা খেলার মাঠে পাড়ার কোনো বড় ছেলে এরকম খারাপ স্পর্শ করতে পারে। বাবা-মায়ের অজান্তে ঘরে এবং বাইরে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সকল সমস্যার কথা মেয়েরা অনেক সময় প্রকাশ করতে পারে না। চুপচাপ হয়ে যায়, ভয় ও লজ্জায় নিজেরাই কষ্ট পেতে থাকে। এ ধরনের ঘটনায় কখনই চুপ করে থাকা বা একা কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। কারণ এখানে মেয়েটির কোনো দোষ থাকে না। যে এ কাজটি করেছে, সে-ই অন্যায় করেছে।

শিশুকে পাচারের উদ্দেশ্যে মাকে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে

এ ধরনের পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। নিজের নিরাপত্তার কথা নিজেই চিন্তা করবে। নিজেকে নিরাপদ রাখার কিছু উপায়–

- ভিড়ের মধ্যে গেলে সচেতন থাকা ও সাবধানতা অবলম্বন করা।
- পরিচিত ও অপরিচিত পরিবেশে একা না যাওয়া।
- বাড়িতে একা থাকলে সাবধানে থাকা।
- কেউ কাছে ডাকলে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কথা বলা।
- কেউ শরীর নেতিবাচক ভঙ্গিতে স্পর্শ করে, এরকম সুযোগ না দেওয়া।
- খারাপ, অশ্লীল আলোচনা করে, এমন বন্ধু-বান্ধব ও ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলা বা বর্জন করা।
- যে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মাকে, পরিবারের বিশ্বস্ত কাউকে অথবা শিক্ষককে জানানো।

সকল বিষয়ে এদেরকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু ভাববে। তবেই তুমি তোমার মনের অস্থিরতা, কষ্ট সহজেই দূর করতে পারবে।

কাজ- ২ প্রচার মাধ্যম থেকে জানা এমন কোনো অপহরণের ঘটনা লেখো। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তা ক্লাসে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরনের খাবার রক্তস্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে?

ক. খনিজ লবণ খ. লৌহজাতীয়
গ. আয়োডিন ঘ. থায়ামিন বি-১

২. বয়ঃসন্ধিক্ষণের একটি সাধারণ ঘটনা–

ক. খোলাখুলি কথা বলা খ. দ্বিধা, সংকোচ করা
গ. স্বাভাবিক আচরণ দেখানো ঘ. খাদ্য গ্রহণ স্বাভাবিক থাকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১২ বছর বয়সী দুরন্ত চঞ্চল রুথি ঈদের বাজারে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিড়ে যেতে চায় না। এসব জায়গায় যেতে সে লজ্জা ও ভয় পায়।

৩. রুথি বিভিন্ন ভিড়ের অনুষ্ঠানে যেতে না চাওয়ার কারণ–

ক. ঝামেলা মনে করা খ. খারাপ স্পর্শ
গ. ভিড় অপছন্দ করা ঘ. পরিচিত সঙ্গ পরিহার করা

৪. উক্ত পরিস্থিতিতে রুথির করণীয়–

i. নিকট জনের সাথে আলোচনা করা
ii. নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
iii. চুপচাপ হয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হাসি-খুশি নীলা হঠাৎ করে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। সব সময়ে ঘরে থাকে কারো সাথে বেশি কথা বলে না। খাবারেও তেমন আগ্রহ নেই। নীলার এ অবস্থা দেখে মা মেয়ের সাথে খোলামেলা কথা বলার চেষ্টা করেন। নীলার মা নীলাকে তার শারীরিক অবস্থা বুঝাতে গেলে নীলা প্রথমে সংকোচ বোধ করলেও ধীরে ধীরে মায়ের সাথে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ক. কখন দেহের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত খাদ্য শক্তির প্রয়োজন হয়?

খ. পুষ্টিমানসম্পন্ন পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা হয়– বুঝিয়ে বলো।

গ. নীলার আচরণিক পরিবর্তনের কারণ– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নীলার মায়ের ভূমিকা নীলাকে স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত করবে– বক্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. কুদ্দুস মিয়া রসুলপুর গ্রামের অসহায় ও অর্থহীন বিনু ও মিনুকে ভালো বেতনে চাকরি দিবেন বলে বিদেশে পাঠান। পরবর্তীতে ১২-১৪ বছরের শান্তা ও শিমুকে বিদেশে চাকরি দিবেন বলে তার সাথে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বুঝাতে থাকে। একদিন শান্তা পেপারে দেখতে পায় বিনু ও মিনুর ছবি– বেআইনিভাবে বিদেশে যাওয়ার জন্য তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সে কুদ্দুসের কাছে চাকরির কাগজপত্র দেখতে চায় এবং পরিবারকে বিষয়টি জানায়।

ক. সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কী দরকার?

খ. কৈশোরে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কী বুঝিয়ে লেখো।

গ. কোন ধরনের জ্ঞানের অভাবে বিনু ও মিনুর এ অবস্থা– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শান্তা ও শিমুর সিদ্ধান্তটি কতখানি যৌক্তিক– বিশ্লেষণ করো।

গ বিভাগ

খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যের কাজ, উপাদান ও উৎস সম্পর্কে জেনে সঠিক খাদ্যাভাস গঠনের মাধ্যমে আমরা সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ভেজাল ও ক্ষতিকর রঞ্জক পদার্থযুক্ত খাদ্য থেকে বিরত থাকতে হবে। কাজেই সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

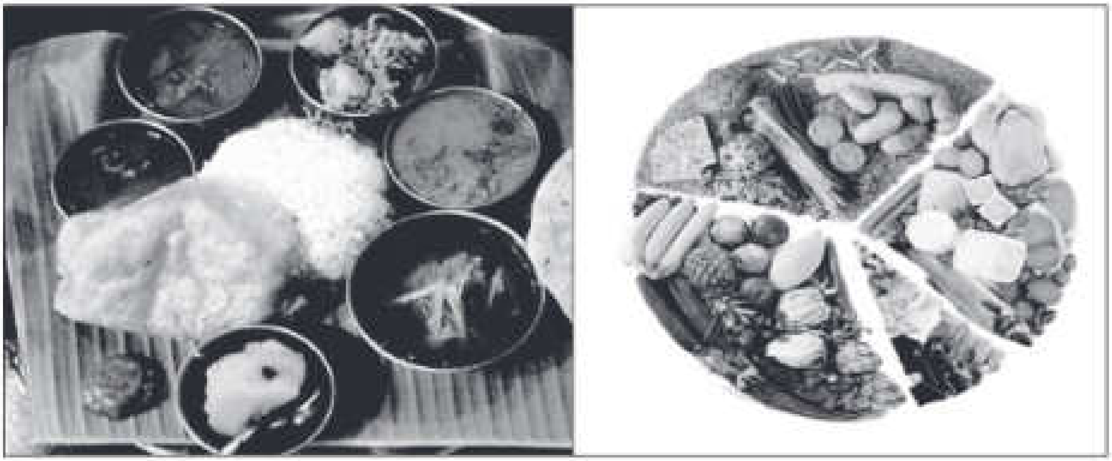

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যের কাজ, উপাদান ও উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যের পুষ্টিমান এবং সুষম খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সঠিক খাদ্য নির্বাচনে আগ্রহী হতে পারব।
- খাদ্য গ্রহণে ভ্রান্ত ধারণা ও কুফল সম্পর্কে জানতে পারব।
- খাদ্যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব, ভেজাল খাদ্য ও ফাস্ট ফুডের অপকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিকল্প খাদ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব।
- স্বাস্থ্য রক্ষায় শারীরিক শ্রম ও ব্যায়ামের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

পাঠ ১– খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

খাদ্য- পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সব প্রাণীরই খাদ্য অপরিহার্য। আমরা প্রতিদিন নানা রকমের খাবার খাই। মানুষ সবকিছু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের জন্য খাদ্য সেইসব বস্তু, যেগুলো মানুষ গ্রহণ করার পর পরিপাক করতে পারে এবং যা শরীরে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল বস্তু গ্রহণের ফলে মানুষের দেহের পুষ্টি সাধন হয় তাকে খাদ্য বলে। আমাদের শরীর গঠনের কাঁচামাল হচ্ছে খাদ্য। নিচের ছকের মাধ্যমে খাদ্য কী তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি।

• ক্ষুধা নিবৃত্ত করে • শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে	• শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখে • শরীরের তাপশক্তি উৎপাদন করে

পুষ্টি- দেহে খাদ্যদ্রব্য শোষণের পর তা বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন– ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে, দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ তৈরি করে, দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন করে, রোগপ্রতিরোধ করে শরীর সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখে। এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে পুষ্টি।

স্বাস্থ্য- আমরা সকলেই জানি– 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।' অনেক সময় আমরা ভালো স্বাস্থ্য বলতে মোটা হওয়াকে এবং খারাপ স্বাস্থ্য বলতে পাতলা শরীরকে বুঝি। কিন্তু কোনো মানুষের শুধুমাত্র মোটা বা চিকন শরীর দেখে স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝা খুবই কঠিন। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, শরীর মোটা কিন্তু তার স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা খুবই কম। সে অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠে এবং কাজে উৎসাহ পায় না। তার চেহারা মলিন থাকে। ঠিকমতো ঘুম হয় না। প্রায়ই নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়। কারো সাথে

সহজে মিশতে পারে না এবং কোনো কিছুই তার ভালো লাগে না। স্বাস্থ্যের সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত। যেমন– দৈহিক অবস্থা, কর্মক্ষমতা, মানসিক অবস্থা, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- "রোগব্যাধি বা দুর্বলতা মুক্ত শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সুস্থ অবস্থাই স্বাস্থ্য।"

একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যাবে-

(১) শরীর সুগঠিত হবে ও স্বাভাবিক কাজ করার মতো যথেষ্ট শক্তি থাকবে।

(২) শরীরের ওজন সঠিক থাকবে।

(৩) মন সব সময় প্রফুল্ল থাকবে ও কাজে উৎসাহ থাকবে।

(৪) রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হবে না।

(৫) ত্বক মসৃণ হবে। চুল উজ্জ্বল ও চকচকে দেখাবে।

(৬) নিয়মিত ঘুম ও মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস থাকবে।

কাজ- ১ তোমার মধ্যে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির কোন কোন লক্ষণ বিদ্যমান আছে তা লেখো।

পাঠ ২- খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

খাদ্য গ্রহণের সাথে দেহের পুষ্টির সম্পর্ক গভীর। আমরা একটু লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, মানুষ যদি বেশ কিছুদিন ঠিকমতো খাদ্য গ্রহণ করতে না পারে তা হলে তাদের শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে যায়, শরীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়, মেধা শক্তি কমে যায়।

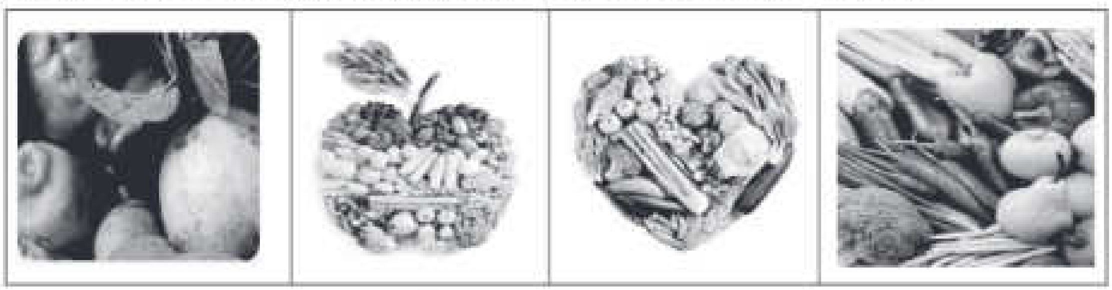

বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে

এক কথায় বলা যায় যে, অপুষ্টি দেখা যায় এবং এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাদ্য গ্রহণ করলে অতিপুষ্টি দেখা যায়, যেমন– শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন– উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। অন্যদিকে সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের যথাযথ পুষ্টি অবস্থা বজায় থাকে।

যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ও দেহের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা হয় তখন দেহ কাজ করা ক্ষমতা লাভ করে, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সহজে রোগে আক্রান্ত হয় না, মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় ও দেহের স্বাভাবিক পুষ্টিগত অবস্থা বজায় থাকে।

কাজ– ১ খাদ্য বেশি খেলে অথবা কম গ্রহণ করলে তোমার কী কী সমস্যা হতে পারে তা লেখো।

পাঠ ৩- খাদ্য, পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক

ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টির সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নিচের চিত্রে দেখতে পাই যে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার রান্না ও খাওয়া হলে দেহ রোগাক্রান্ত হয় ও পুষ্টি প্রাপ্তি ব্যাহত হয়, অন্যদিকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার রান্না ও খাওয়া হলে দেহে যথাযথ পুষ্টি প্রাপ্তি ঘটে।

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার রান্না ও খাওয়া →	জীবাণু দ্বারা খাদ্য সংক্রমিত হয় →	সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণ →	দেহ রোগাক্রান্ত হয় ও পুষ্টি প্রাপ্তি ব্যাহত হয়
পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার রান্না ও খাওয়া →	খাদ্য নিরাপদ থাকে →	নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ →	দেহে যথাযথ পুষ্টি প্রাপ্তি ঘটে

এখানে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বলতে খাদ্যদ্রব্য কাটাবাছার স্থান, খাদ্যদ্রব্য ধোওয়ার কাজে ব্যবহৃত পানি ও ধোওয়ার জায়গা, রান্না ও খাদ্য পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র, রান্নার পর খাদ্যদ্রব্য রাখার স্থান, খাওয়ার জায়গা, যিনি রান্না ও পরিবেশন করেন তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য ঢেকে সংরক্ষণ, যিনি খাদ্য গ্রহণ করেন তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সকল বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকেই বোঝায়।

বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর উৎস হলো অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। আর এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশেই খাদ্য বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। আর এই সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন– কোনো শিশুর মা তার জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শিশুটি অপরিচ্ছন্ন হাতে খাবার খাওয়ার কারণে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলো। এর ফলে তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বের হয়ে গেল এবং শরীর দুর্বল হয়ে গেল। এই অবস্থায় অর্থাৎ শিশুটির দুর্বল শারীরিক অবস্থায় রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকার কারণে পুনরায় বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু দ্বারা শিশুটির আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি বেড়ে যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, একবার অসুস্থ হওয়ায় শরীর দুর্বল থাকে বলে পুনরায় জীবাণু দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কা অনেক বেশি হয় এবং এই সময় যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এই দুইটি বিষয় নিশ্চিত করতে না পারলে বার বার অসুস্থ হওয়ার আশংকাও বেড়ে যায়। বিষয়টি অনেকটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। একে অপুষ্টি ও অপরিচ্ছন্নতার ক্ষতিকর চক্র বলে।

অপুষ্টি ও অপরিচ্ছন্নতার ক্ষতিকর চক্র

পরিশেষে বলা যায় যে, খাদ্য প্রস্তুত থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে খাদ্য জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। এইজন্য খাদ্য প্রস্তুত ও খাওয়ার আগে সকলেরই উচিত সাবান দিয়ে খুব ভালো করে হাত ধুয়ে নেওয়া। তাতে জীবাণু দ্বারা রোগ সৃষ্টির আশংকা অনেক কমে যাবে।

কাজ- ১ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি ও গ্রহণ করলে কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে পোস্টার পেপারে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৪- খাদ্যের কাজ

খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন–

১। দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন- খাদ্যের প্রধান কাজ হলো শরীর গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করা। খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শিশুর দেহের বৃদ্ধি ও সুগঠিত হওয়ার কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

২। ক্ষয়পূরণ- প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ পুনর্গঠন করার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের। প্রতিনিয়তই পুরাতন কোষের মৃত্যু ঘটে নতুন কোষ তৈরি হয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান এই নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আমাদের হাত কেটে গেলে, রোগে আক্রান্ত হলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে শরীরের যে ক্ষয় হয় তা পুষ্টিকর খাদ্যের সহায়তায় ধীরে ধীরে সেরে ওঠে।

৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান- গাড়ি চালানোর জন্য যেমন জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল বা গ্যাসের প্রয়োজন হয় তেমনি শরীরের বিভিন্ন কাজ, রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্যের পরিপাক, মলমূত্র ত্যাগ এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। এমন কি যখন আমরা ঘুমাই তখনও শক্তি খরচ হয়। খাদ্য থেকে তাপ সৃষ্টি হয় ও শক্তি উৎপাদন হয়। এজন্য বেঁচে থাকার জন্য শক্তি উৎপাদন অপরিহার্য।

৪। অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ- আমাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের কাজ ঘটে থাকে, যার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যেমন– খাদ্য পরিপাক, শক্তি উৎপাদন, পেশির সঞ্চালন, কোষের গঠন ইত্যাদি। দেহের ভেতরে যে কাজগুলো ঘটছে সেগুলোর জন্যও খাদ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি- প্রতিদিনই আমাদের শরীর বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়। এই জীবাণু আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য চাই শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। আর বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জিত হয় ও শরীর সহজেই সুস্থ থাকে। পুষ্টির অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় ও বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং সহজেই অসুস্থ হবার প্রবণতা বেড়ে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, খাদ্য শুধু ক্ষুধাই নিবৃত্ত করে না, শরীরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কাজ ১ তোমার শরীরে খাদ্য কী কী কাজ করতে সাহায্য করে পোস্টার পেপারে প্রদর্শন করো।
কাজ ২ খাবার ঠিকমতো না খেলে তোমার দেহে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে তুমি মনে করো।

পাঠ ৫- খাদ্যের উপাদান ও উৎস

খাদ্যকে ভাঙলে যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান পাওয়া যায় তাদেরকে খাদ্য উপাদান বলে। এই খাদ্য উপাদানগুলো প্রধানত জৈব রাসায়নিক বস্তু। এই বস্তুগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে অর্থাৎ পুষ্টি সাধন করে, তাই এদেরকে পুষ্টি উপাদানও বলে। পুষ্টি উপাদানগুলো প্রধানত ছয় প্রকার।

- খাদ্য উপাদান
  - কার্বোহাইড্রেট
  - প্রোটিন
  - ফ্যাট
  - ভিটামিন
    - চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন
      - ভিটামিন এ, ডি, ই, কে
    - পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন
      - ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি
        - ১৫টি ভিটামিন যেমন থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, ফলিক এসিড ইত্যাদি
  - খনিজ লবণ
    - ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, দস্তা, আয়োডিন ইত্যাদি
  - পানি

নিচে ছকের মাধ্যমে খাদ্য উপাদানগুলোর উৎস ও কাজ দেখানো হলো-

পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যের চিত্র	ছয়টি পুষ্টি উপাদানের প্রধান খাদ্য উৎস ও কাজ
(কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য)	**কার্বোহাইড্রেট** উৎস- চাল, ভুট্টা,যব, গম, সাগু, আলু, মিষ্টি আলু, চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকোলেট ইত্যাদি। কাজ- দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা।

 (প্রোটিনজাতীয় খাদ্য)	**প্রোটিন** প্রাণিজ উৎস- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, ছানা ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ উৎস- বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম, চাল, গম, বিচি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি। কাজ- দেহের কোষ গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা।
 (ফ্যাটজাতীয় খাদ্য)	**ফ্যাট** উদ্ভিজ্জ উৎস- সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, নারিকেল ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস - ঘি, মাখন, কড মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল, পশু-পাখির চর্বি ইত্যাদি। কাজ- দেহে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা।
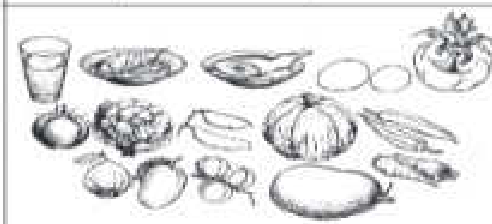 (ভিটামিন ও ধাতব লবণজাতীয় খাদ্য)	**ভিটামিন ও ধাতব লবণ** প্রাণিজ উৎস- সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য । উদ্ভিজ্জ উৎস- ঢেঁকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি যেমন- ঢেঁড়স, পেঁপে, চিচিংগা, লাউ, বেগুন, ধুন্দুল, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া, গাজর,ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন- আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, আতা, সফেদা, গাব, বরই, কুল, জাম্বুরা, বেল, লেবু, পেয়ারা, পাকা পেঁপে, আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদি। কাজ- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীর সুস্থ ও সবল রাখা।
 (পানির উৎসের চিত্র)	**পানি** উৎস- সব ধরনের তরল খাবার, ডাবের পানি, রসাল ফল ইত্যাদি। কাজ- খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করা। শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতেও সাহায্য করে।

উপরের ছক থেকে আমরা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের উৎস সম্পর্কে জানলাম। এই পুষ্টি উপাদানগুলোর প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করি তা হলে সহজেই পুষ্টি উপাদানগুলোর চাহিদা মেটানো সম্ভব।

কাজ- ১ খাদ্যের ৬টি উপাদানের ৩টি করে উৎসের নাম লিখ ও ছবি এঁকে শ্রেণিতে প্রদর্শন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান কয়টি–

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

২. মানব দেহে পুষ্টি সাধনের জন্য খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন–

ক. সামান্য পরিমাণে খ. পর্যাপ্ত পরিমাণে
গ. অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ ঘ. ভিটামিন সমৃদ্ধ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুমানা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব দুর্বল বোধ করে এবং প্রায় সময় সে ঘুমাতে চায়। তার সহপাঠীরা তার চেয়ে লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

৩. রুমানার এ অবস্থার কারণ–

ক. পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করা খ. পরিমিত পরিমাণে না ঘুমানো
গ. পরিমিত ব্যায়াম না করা গ. সময় মেনে খেলাধুলা না করা

৪. রুমানার এ সমস্যা দূরীকরণের উপায়–

i. প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাদ্য গ্রহণ
ii. যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ
iii. বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান বেশি গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুপ্তি ও কান্ত চাচার বাড়িতে বেড়াতে এলে চাচাতো বোন হেমা লক্ষ করল কান্তের শরীরটা ফোলা ফোলা। হেমা কান্তের মোটা হওয়ার কারণ জানতে চাইলে চাচি জানালেন অল্প খেলেও দিন দিন তার শরীর ফোলা হয়ে যাচ্ছে। হেমার চাচি আরও জানালেন কয়েকদিন হতে সুপ্তি সন্ধ্যার পর ঝাপসা দেখছে।

ক. খাদ্যের উপাদান কয়টি?

খ. দেহের ক্ষয়পূরণ বলতে কী বোঝায় লেখো।

গ. উদ্দীপকে হেমার দেখা কান্তের শারীরিক অবস্থার কারণ কী ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কোন বিষয়ের অজ্ঞতা কান্ত ও সুপ্তির শারীরিক সমস্যার জন্য দায়ী বলে তুমি মনে করো।

২. নিচের চিত্রটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পুষ্টি কী?

খ. খাদ্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক কী? বুঝিয়ে লেখো।

গ. যে পরিবেশে ২ নং চিত্রে খাদ্য গ্রহণ করছে তার উপকারিতা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ১ নং চিত্রের পরিবেশ অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করলে 'ক্ষতিকর চক্র' মতে কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সৃষ্টি হবে বুঝিয়ে লেখো।

নবম অধ্যায়

খাদ্যের পুষ্টিমূল্য

পাঠ ১- চাল ও গম

চালের পুষ্টিমূল্য- চাল বাংলাদেশের প্রধান শস্যজাতীয় খাদ্য। আমাদের দেশে প্রধানত সিদ্ধ ও আতপ এই দুই ধরনের চাল ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ঢেঁকিছাঁটা চাল ও কলে ছাঁটা চাল। যেকোনো চালে প্রায় সমপরিমাণ খাদ্য শক্তি থাকে। চাল কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস।

ঢেঁকিছাঁটা চাল

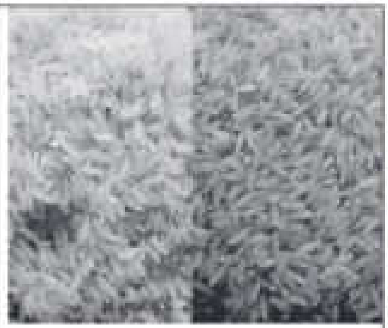

চাল

একনজরে চালের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
কার্বোহাইড্রেট	প্রোটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন ও নায়াসিন

ঢেঁকিছাঁটা সিদ্ধ চালে প্রোটিন কিছুটা বেশি থাকে। ভাত রান্নার সময় মাড় ফেলে দিলে অনেক মূল্যবান পুষ্টি উপাদান চলে যায়। তাই মাড় না ফেলে বসাভাত রান্না করা উচিত। চাল ছাড়াও ধান দিয়ে চিড়া, মুড়ি, খই হয়। এসব খাবারের পুষ্টিমূল্য প্রায় চালের মতো।

কাজ- ১ কীভাবে ভাত রান্না করলে পুষ্টিমূল্য বজায় থাকবে?

গমের পুষ্টিমূল্য- চালের পর আমাদের বাংলাদেশের দ্বিতীয় শস্যজাতীয় খাদ্য হলো গম। গম থেকে আমরা আটা, ময়দা ও সুজি পাই। ময়দার চাইতে আটা ও সুজির পুষ্টিমূল্য বেশি। গম ভাঙানোর সময় গমের বাইরের আবরণ ভুসি হয়ে বেরিয়ে যায়।

গম থেকে চালের প্রায় কাছাকাছি পরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায় এবং চালের চাইতে বেশি পরিমাণে প্রোটিন থাকে। গম দিয়ে তৈরি সকল খাদ্য থেকে প্রায় সমপরিমাণ খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। ভুসি ও ময়দার চাইতে আটাতে প্রোটিন কিছুটা বেশি থাকে।

গম

একনজরে গমের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
কার্বোহাইড্রেট	প্রোটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, ভিটামিন ই

আজকাল বাজারে দুই ধরনের আটা পাওয়া যায়– সাদা আটা ও লাল আটা। সাদা আটায় গমের উপরের আবরণ থাকে না। আর লাল আটায় গমের উপরের আবরণ থাকে। স্বাস্থ্যের জন্য লাল আটা উপকারী।

কাজ- ২ গমের তৈরি বিভিন্ন খাদ্যের নাম লেখো এবং খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বর্ণনা করো।

পাঠ ২- মাছ ও মাংস

মাছের পুষ্টিমূল্য- প্রাণিজ প্রোটিনের খুব ভালো উৎস হচ্ছে মাছ। এছাড়াও মাছে ফ্যাট ও ধাতব লবণ পাওয়া যায়। কম ফ্যাটযুক্ত মাছের মধ্যে টাকি, বেলে, বাটা, ফলি, রুই, কাতলা, মৃগেল, বাইম, শিং, মাগুর, মলা, চেলা এগুলো উল্লেখযোগ্য। খলসে চেলা, পুঁটি, কাজলি, বোয়াল, শোল, মাঝারি ফ্যাটযুক্ত মাছ। বেশি ফ্যাটযুক্ত মাছের মধ্যে আছে ইলিশ, শিলং, পাঙ্গাশ, কই, সরপুঁটি ইত্যাদি। মাছে ফ্যাট বেশি হলে তা খেতে যেমন খুব সুস্বাদু হয় তেমনি সেইসব মাছে খাদ্য শক্তি বেশি থাকে।

একনজরে মাছের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
প্রোটিন	ফ্যাট, ভিটামিন এ, ডি এবং ই, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ

বাংলাদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে শুঁটকি মাছ খুবই জনপ্রিয়। শুঁটকি মাছে তাজা মাছ অপেক্ষা ২-৩ গুণ বেশি প্রোটিন থাকে। এছাড়াও শুঁটকি মাছে তাজা মাছের চাইতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে।

তাজা বড় মাছ

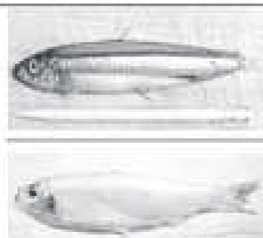
তাজা ছোট মাছ

ছোট মাছের শুঁটকি

বড় মাছের শুঁটকি

মাছের কাঁটাতে ক্যালসিয়াম থাকে, তাই যে মাছ কাঁটাসহ খাওয়া যায়, সেই মাছ থেকে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় যেমন- ছোটমাছ। সামুদ্রিক মাছ থেকে আয়োডিন পাওয়া যায়। কিন্তু সামুদ্রিক মাছ যেমন- কড ও শার্ক মাছের যকৃতের তেলে ভিটামিন এ ও ভিটামিন ডি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাজ-১ তুমি কোন ধরনের মাছ খাও তার তালিকা তৈরি করো এবং তা থেকে তুমি কী কী পুষ্টি পাবে লেখো।

মাংসের পুষ্টিমূল্য- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, ইত্যাদি পশু ও পাখির দেহের পেশিবহুল অংশ আমরা মাংস হিসাবে গ্রহণ করি। আমাদের দেশে গরু ও খাসির মাংস ছাড়াও মুরগির মাংস খুব বেশি জনপ্রিয়। এছাড়াও হাঁসের মাংস ও বিভিন্ন পাখির মাংসও আমরা খেয়ে থাকি। মাংস উন্নত মানের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য।

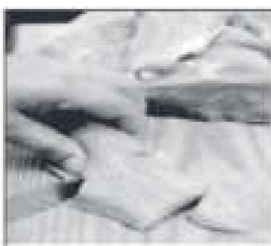
গরুর মাংস

খাসির মাংস

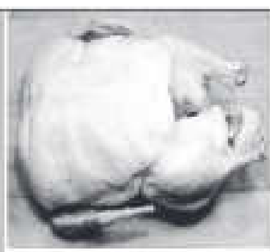
হাঁসের মাংস

মুরগির মাংস

মাংসের খাদ্যশক্তির পরিমাণ ফ্যাটের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। মাংস লৌহ ও ফসফরাসের এবং যকৃৎ বা কলিজা লৌহ এবং ভিটামিন এর খুব ভালো উৎস। ক্যালসিয়াম প্রধানত হাড়ে পাওয়া যায়। হাড় ছাড়া মাংসে ক্যালসিয়াম খুবই কম পাওয়া যায়। মাংস ও যকৃৎ থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, বি১২ এবং অন্যান্য বি-ভিটামিনের ভালো উৎস।

একনজরে মাংসের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
প্রোটিন	ফ্যাট, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, বি$_{১২}$, ভিটামিন এ, ডি এবং ই, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ

দেশি মুরগির মাংস ও পাখির মাংসে অন্যান্য প্রাণীর মাংসের চাইতে কম ফ্যাট থাকে। তবে ফার্মের মুরগি ও হাঁসের মাংসে ফ্যাট বেশি থাকে। হাঁস ও মুরগির কলিজাতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে। এছাড়াও ভিটামিন এ ও ডি এবং বি ভিটামিনের উৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে হাঁস ও মুরগির কলিজা।

কাজ- ২ তুমি মাছ ও মাংসের তৈরি যে খাবারগুলো খাও তার তালিকা তৈরি করো।
কাজ- ৩ এই সকল খাদ্য থেকে তুমি কী কী পুষ্টি পাবে তা বর্ণনা করো।

পাঠ ৩- ডাল, ডিম ও দুধ

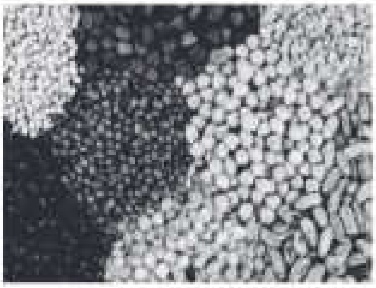

বিভিন্ন ধরনের ডাল

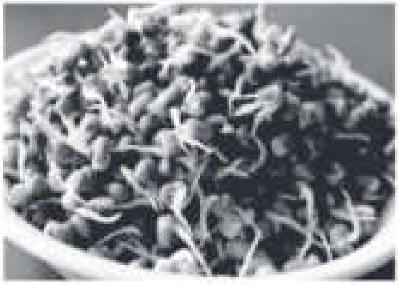

অংকুরিত ডাল

ডালের পুষ্টিমূল্য- মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাষকলাই, অড়হর ডালজাতীয় খাদ্য। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রোটিন থাকায় ডাল প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। ডালে স্নেহপদার্থ খুব কম। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাছ ও মাংসের পরিবর্তে ডাল খাওয়া যায়।

২০১৫

এক নজরে ডালের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন ও নায়াসিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ

ডাল থায়ামিনের বেশ ভালো উৎস। ডালে রিবোফ্লাভিন এবং নায়াসিনও ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। ডালে ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। ছোলা, মুগ, মাষকলাইয়ের খোসাসহ আস্ত বীজ ভিজিয়ে রাখলে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে অঙ্কুরোদগম হয়। অঙ্কুরিত ডালে অন্যান্য প্রায় সব ভিটামিনই শুকনা ডালের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে।

কাজ- ১ শুকনা ডাল ও অঙ্কুরিত ডালের মধ্যে কোনটি বেশি পুষ্টিকর বলে তুমি মনে করো? কেন তা লেখো।

ডিমের পুষ্টিমূল্য- প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ডিম সবচেয়ে ভালো। দেহ গঠনের উপযোগী সব উপাদান ডিমে উপস্থিত। ডিমে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন এবং ধাতব লবণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে। ডিমের সাদা অংশ ও কুসুমের মধ্যে উপাদানের তফাত হয়। ডিমের সাদা অংশ সম্পূর্ণটা প্রোটিন, এতে ফ্যাট নেই বললেই চলে। ডিমের কুসুমে লৌহ, ফসফরাস, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়।

ডিম

একনজরে ডিমের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
প্রোটিন	ভিটামিন এ, ডি, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন ও নায়াসিন, ফসফরাস ও লৌহ

রাজহাঁসের ডিম ও মুরগির ডিমের তুলনা

ডিমের প্রোটিন উৎকৃষ্ট মানের এবং শতকরা ১০০ ভাগই দেহে কাজে লাগে। আমাদের দেশে হাঁসের ডিমও পাওয়া যায়। হাঁসের ডিম মুরগির ডিমের চেয়ে আকারে কিছুটা বড় হওয়ায় এতে খাদ্য শক্তি বেশি থাকে। মুরগির ডিমের চেয়ে হাঁসের ডিমে ভিটামিন এ বেশি থাকে। এছাড়া একটা মুরগির ডিম থেকে যে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় আকারে বড় হওয়ায় সেই পুষ্টি উপাদানগুলো হাঁসের ডিম থেকে কিছুটা বেশি পাওয়া যায়। এছাড়াও আমাদের দেশে মুরগি, হাঁস, রাজহাঁস ও কোয়েল পাখির ডিম খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। ডিমের আকার অনুসারে পুষ্টিমূল্য কম বেশী হতে পারে।

দুধের পুষ্টি মূল্য- দুধ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি একটি আদর্শ খাদ্য। দুধের মধ্যে সব কয়টি পুষ্টি উপাদান থাকে। দুধে প্রায় ৯০% পানি। গুণগত দিক থেকে দুধের প্রোটিন উচ্চ মানের। ভিটামিনের মধ্যে রিবোফ্লাভিনের পরিমাণ বেশি। দুধে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস থাকে । যা হাড় গঠনের সহায়তা করে। দুধ সুস্বাদু ও সহজপাচ্য। জন্মগ্রহণের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। গরু, ছাগল ও মহিষের দুধ আমাদের দেশে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দুধ থেকে ছানা, পনির, দই ও নানা ধরনের মিষ্টিজাত খাবার তৈরি হয়।

কাজ- ২ একটা সিদ্ধ ডিম থেকে তুমি কী কী পুষ্টি পাবে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৪- শাক-সবজি ও ফল

শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিমূল্য- শাক-সবজি ও ফল দৈনন্দিন খাদ্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। শাক-সবজি ও ফলের মধ্যে প্রধানত কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, ধাতব লবণ ও পানি পাওয়া যায়। ভিটামিন ও ধাতব লবণের প্রাচুর্যতা থাকায় শাক-সবজি ও ফল দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির কাজ সম্পন্ন করে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে। সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের আহারে শাক ও সবজি থাকা বাঞ্ছনীয়।

এক নজরে শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
ভিটামিন, ধাতব লবণ ও পানি	কার্বোহাইড্রেট

সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকার মাটিতে আয়োডিন থাকে বলে সে মাটিতে উৎপন্ন শাক-সবজি থেকে আয়োডিন পাওয়া যায়। ফুলকপি, কাঁচামরিচ, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, টমেটো ভিটামিন-সি-এর ভালো উৎস। ব্রোকলি থেকে ক্যালসিয়াম ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। শুঁটি ও বীজ-সবজি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস। শুঁটি ও বীজ সবজি থেকে ভিটামিনও ভালো পাওয়া যায়। শাক-সবজিতে আঁশজাতীয় কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে যা খুবই উপকারী।

কাঁচা ফল অপেক্ষা মিষ্টি ফলে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে। তাজা টাটকা ফলে ফসফরাস ও লৌহ এবং সামান্য ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। লেবুজাতীয় ফল, জামজাতীয় ফল ভিটামিন-সি-এর জন্য উল্লেখযোগ্য। হলুদ ও কমলা রঙের ফলে যেমন– পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি ফলে ভিটামিন এ ও ক্যারোটিন পাওয়া যায়। তাজা ফলে ভিটামিন বেশি থাকে। রসালো ফল পানির চাহিদা পূরণ করে থাকে। আমাদের দেশে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন স্বাদের ফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত মৌসুমি ফল মৌসুমেই বেশি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়। তাই সব সময় মৌসুমি ফল খাওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

পাঠ ৫- বাদাম, তেল ও ঘি

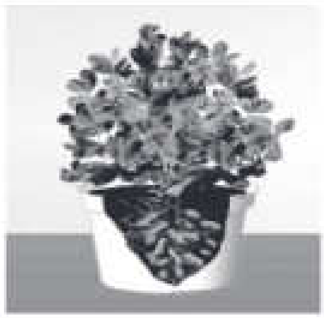

বাদামের পুষ্টিমূল্য- বাংলাদেশে উৎপাদিত বাদামের মধ্যে চিনা বাদাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাজু বাদাম, পেস্তাবাদাম ও কাঠবাদাম রয়েছে।

একনজরে বাদামের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
প্রোটিন ও ফ্যাট	কার্বোহাইড্রেট, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, জিংক ও লৌহ

চিনা বাদাম ফসফরাসের ভালো উৎস। লৌহ ও ক্যালসিয়ামও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্যান্য ধাতব লবণের মধ্যে ম্যাংগানিজ, পটাশিয়াম, কপার ও জিংক পাওয়া যায়। অত্যন্ত পুষ্টিকর এই খাবারটি খেতেও সুস্বাদু। তাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

> **কাজ- ১** বাদাম কোন পুষ্টি উপাদানের উৎকৃষ্ট উৎস? তুমি কোন খাবারের পরিবর্তে বাদাম খাবে লেখো।

তেল ও ঘিয়ের পুষ্টিমূল্য- উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। ভোজ্য তেল প্রধানত রান্নায় ব্যবহৃত হয়। সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, চিনা বাদাম, সয়াবিন, তুলাবীজ, ও ভুট্টা ইত্যাদিতে বেশ ভালো পরিমাণে স্নেহপদার্থ থাকে। তাই এই বীজগুলো থেকে তেল উৎপাদিত হয়। খাদ্যের মধ্যে তেল থেকে সবচেয়ে বেশি তাপ শক্তি পাওয়া যায়।

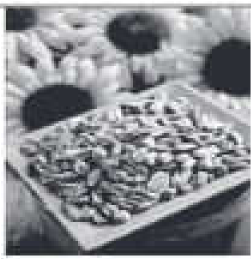	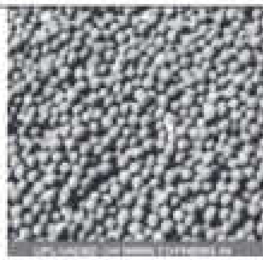	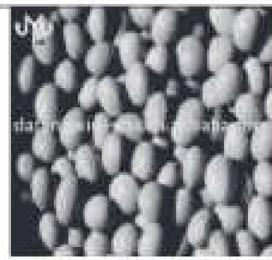
সূর্যমুখীর বিচি	সরিষা	সয়াবিন

একনজরে তেল ও ঘিয়ের পুষ্টিমূল্য

প্রধান পুষ্টি উপাদান	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপাদান
ফ্যাট	ভিটামিন এ, ডি, ই, কে

প্রাণিজ উৎস হতে ঘি পাওয়া যায়। দুধের সর থেকে প্রথমে মাখন ও মাখন থেকে ঘি তৈরি হয়। ঘিয়ে প্রধানত ফ্যাট থাকে এতে আরও থাকে এ, ডি, ই, কে। তেল ও ঘি খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

কাজ- ১ তেল ও ঘি শরীরে কী ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে একটা তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চাল কোন পুষ্টি উপাদানের সবচেয়ে ভালো উৎস?

ক. ভিটামিন খ. প্রোটিন
গ. কার্বোহাইড্রেট ঘ. ফ্যাট

২. শিম বিচির অন্যতম কাজ–

i. দেহের ক্ষয়পূরণ
ii. বৃদ্ধি সাধন
iii. তাপ ও শক্তি উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. **i** খ. **i ও ii**
গ. **ii ও iii** ঘ. **i, ii ও iii**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩ বছর বয়সী রতন ও ৪৫ বছর বয়সী রতনের বাবা দুই জন প্রায়ই অন্যান্য স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি গরম ভাতের সাথে ঘি ও চিনি মিশিয়ে খেয়ে থাকেন।

৩. রতনের এ খাদ্যাভ্যাসের ফলে–

ক. কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে খ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে
গ. দেহের ক্ষয়পূরণ হবে ঘ. হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

৪. রতনের বাবার ঘি খাওয়ার ফলে–

ক. কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে খ. ওজন বেড়ে যাবে

গ. হাড়ের ক্ষয় হ্রাস পাবে ঘ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাহেলা গ্রীষ্মের ছুটিতে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়ে দেখে সৈকতের পাশে বিভিন্ন দড়িতে মাছ ঝুলিয়ে শুকানো হচ্ছে। সে জানত সব সময় নদী ও পুকুর হতে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করা হয়। তারা সব সময়ে এ ধরনের মাছ খেয়ে থাকে। রাহেলা তার নানার কাছে মাছ শুকানোর কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুকানোর পরে এগুলো প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। দেশ-বিদেশে এই শুকনো মাছের অনেক চাহিদা।

ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় শস্য জাতীয় খাদ্য কী?

খ. ডিমের পুষ্টিমূল্য বর্ণনা করো।

গ. উদ্দীপকে রাহেলার সমুদ্র সৈকতে দেখা মাছ আমাদের দেহে কোন খাদ্য উপাদানের চাহিদা পূরণ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাহেলা সব সময়ে যে ধরনের মাছ খেয়ে থাকে এবং সমুদ্র সৈকতে দেখা মাছের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা করো।

২.

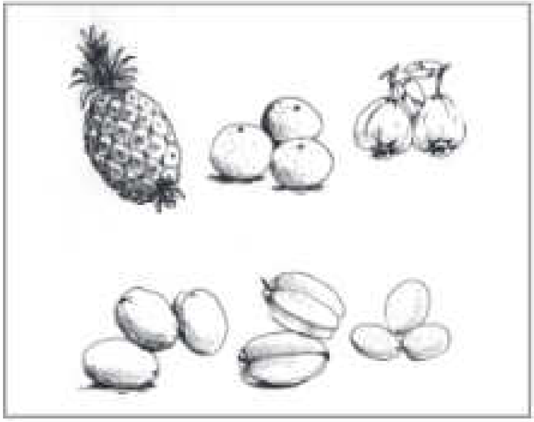

চিত্র-১

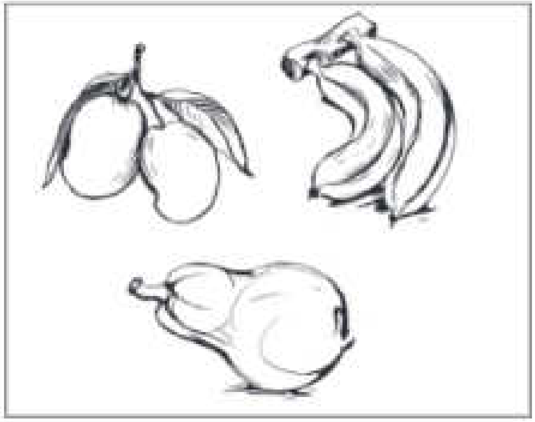

চিত্র-২

ক. চালের চাইতে গমে কী বেশি পরিমাণে থাকে?

খ. লাল গমে খাদ্যোপাদান বেশি থাকে বুঝিয়ে বলো।

গ. চিত্রে উল্লিখিত ছবিগুলো আমাদের দেহে কোন ধরনের ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ১ ও ২ নং চিত্রে উল্লিখিত ফলগুলো প্রতিদিন আহারে থাকা বাঞ্ছনীয় কেন? বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

খাদ্য চাহিদা

পাঠ ১- খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)

আমরা প্রতিদিন অনেক ধরনের খাবার খেয়ে থাকি। এইসব খাবারের মধ্যে কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান থাকে যেগুলো আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদন করে থাকে। খেলাধুলা করা, যেকোনো ধরনের কাজ করা, পড়ালেখা করা ইত্যাদি সব কাজের জন্যই শক্তি দরকার হয়। আমরা খাবারের এই শক্তি চোখে দেখি না তবে অনুভব করতে পারি ও পরিমাপ করতে পারি। কোনো খাবার কেনার সময় মাপার জন্য আমরা একক ব্যবহার করি। যেমন- তরল খাবার মাপার জন্য লিটার ও অন্যান্য খাবার মাপার জন্য কেজি। ঠিক তেমনি খাবারের মধ্যে এই শক্তিকে পরিমাপ করার জন্য কিলোক্যালরি ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করার জন্য বেশি শক্তির অর্থাৎ বেশি কিলোক্যালরির প্রয়োজন হয় এবং কম পরিশ্রমের কাজ করার জন্য কম শক্তির অর্থাৎ কম কিলোক্যালরির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ খাদ্যের শক্তি পরিমাপের একককে কিলোক্যালরি বলা হয়।

শক্তির উৎস- খাবার থেকেই আমরা শক্তি পাই। কোনো খাবারের কিলোক্যালরি বেশি হলে বোঝা যাবে যে, সেই খাবারে শক্তি বেশি আছে। তেল, ঘি, ভাজা খাবার, চিনি, গুড়, মিষ্টি ইত্যাদিতে বেশি কিলোক্যালরি আছে অর্থাৎ এইসব খাবারে শক্তি বেশি আছে। যেমন- শাক-সবজি, শসা, ক্ষীরা, লেটুস পাতা, আমলকী, বাতাবিলেবু, পেয়ারা ইত্যাদিতে কম কিলোক্যালরি আছে অর্থাৎ শক্তি কম আছে।

পুষ্টি উপাদানগুলো থেকে প্রাপ্ত শক্তি
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি পাওয়া যায় ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি পাওয়া যায় ১ গ্রাম ফ্যাট থেকে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়

কোনো মানুষের এই শক্তির চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে তার পরিশ্রমের ধরন, শারীরিক অবস্থা ও বয়স ইত্যাদি বিষয়ের উপর। কোনো ব্যক্তি যদি বেশি পরিশ্রমের কাজ করেন যেমন- রিক্সাচালক হন তাহলে তার বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে, কিন্তু ব্যক্তি যদি কম পরিশ্রমের কাজ করেন যেমন- অফিসে বসে কাজ করেন, তাহলে তার কম কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে।

বড়দের তুলনায় শিশুদের বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য প্রয়োজন হয় কারণ শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত গতিতে হয়। আবার স্বাভাবিক শারীরিক অবস্থার চেয়ে জ্বর হলে বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্যের চাহিদা বাড়ে।

কেউ দীর্ঘদিন ধরে যদি তার চাহিদার চেয়ে বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে তার শরীরের ওজন বেড়ে যাবে। আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে যদি তার চাহিদার চেয়ে কম কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে তার শরীরের ওজন কমে যাবে। শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখতে হলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।

কাজ- ১ কাদের বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন হয়? তুমি যদি প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য গ্রহণ কর তাহলে তোমার কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২- সুষম খাদ্য

মিনু এবং অন্তরা দুজন একই বয়সী, একই শ্রেণিতে পড়ে ও পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করে। মিনু প্রতিদিন ভাত-রুটির পাশাপাশি মাছ-মাংস এবং যথেষ্ট পরিমাণে শাক-সবজি ও মৌসুমি ফল গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তরা শাক-সবজি ও ফল একদম পছন্দ করে না, তাই সে শুধুমাত্র মাংস দিয়ে ভাত খায়। মিনুর স্বাস্থ্য ভালো। সে সহজে অসুস্থ হয় না, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকে, পড়াশোনায় মনোযোগী ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে থাকে। কিন্তু অন্তরা প্রায়ই নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়। ফলে স্কুলে অনিয়মিত, পড়াশোনায় মনোযোগ কম ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, মিনু বিভিন্ন ধরনের খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খায় বলে তার প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। অন্যদিকে অন্তরা প্রয়োজনের চেয়ে কম খাবার গ্রহণ করে। ফলে তার প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না।

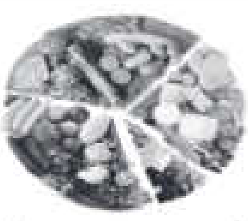
বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য সুষম হয়।

এক বা দুই ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য সুষম হয় না

অতএব, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যেকটা পুষ্টি উপাদান অর্থাৎ ছয়টি উপাদানই প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। দৈনন্দিন খাবারে দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকটা পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে তখন তাকে সুষম খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্য দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, ধাতব লবণ, পানি ও ক্যালরি সরবরাহ করে। শুধুমাত্র একটি দুইটি খাদ্য গ্রহণ করলে খাবার সুষম হয় না।

খাবার সুষম করার উপায়-

- প্রতি বেলার খাবারে মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, রুটি, শাক-সবজি, ফল, তেল ও দুধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণে গ্রহণ করা।
- প্রতিবেলার খাবারে মৌসুমি শাক-সবজি, ফলমূল ও টকজাতীয় ফল রাখা।
- প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা।
- দৈনিক প্রয়োজনীয় মোট কিলোক্যালরির ৫০-৬০% কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, ২০-৩০% স্নেহজাতীয় খাদ্য এবং ২০-২৫% প্রোটিনজাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা।

  দৈনিক আহারে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে কমপক্ষে ৩০ গ্রাম তেল এবং ২০ গ্রাম গুড় বা চিনি না থাকলে ক্যালরির ঘাটতি হয়। এজন্য আহারে তেল ও গুড় বা চিনি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সুষম খাদ্যকে উপাদেয় করার জন্য খাদ্য প্রস্তুতে মশলার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

সুষম খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব-

- শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সকল পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম।
- শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্যশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব রয়েছে।
- শরীরের চাহিদার চেয়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর মোটা হয়ে যাবে, রোগ দেখা দিবে। কম খেলে শরীর শুকিয়ে যাবে, শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হবে ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে যাবে। এজন্য শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক।
- অপুষ্টিকে প্রতিহত করার জন্য সুষম আহার গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

> কাজ- ১ তুমি প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাও তার একটা তালিকা তৈরি করে দেখো যে তোমার খাবারটি সুষম হচ্ছে কি না। যদি সুষম না হয় তা হলে তুমি সুষম খাবার খাওয়ার জন্য কী করবে?

পাঠ ৩- খাদ্য পিরামিড

'খাদ্য পিরামিড' হচ্ছে এমন একটা নির্দেশিকা বা গাইড, যার দ্বারা কোন ধরনের খাদ্য কী পরিমাণে খাওয়া উচিত তা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এক কথায় বলা যায় যে, খাদ্য পিরামিড থেকে কোন ধরনের খাবার কতটুকু পরিমাণে গ্রহণ করলে খাদ্য সুষম হবে তার ধারণা পাওয়া যায়।

'খাদ্য পিরামিড'-এ প্রতিদিন আমাদের যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করা উচিত, সেই খাদ্যগুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করে ছবিতে দেওয়া হয়েছে। পিরামিডের নিচ থেকে ধাপগুলো হচ্ছে–

প্রথম ধাপে– পানি। যা আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন হয়।

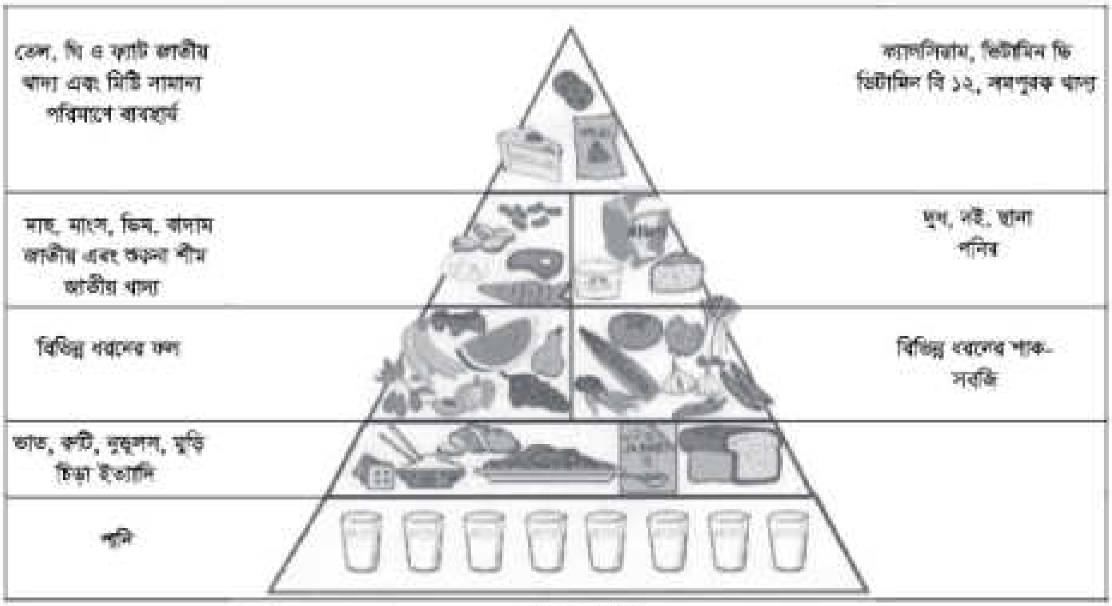

খাদ্য পিরামিড

দ্বিতীয় ধাপে– শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্য। যেমন– ভাত, রুটি, নুডুলস, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি। এই শ্রেণির খাবারগুলো থেকে তাপশক্তি পাওয়া যায়। এই শ্রেণির খাবারগুলো দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়।

তৃতীয় ধাপে- বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফল, এই শ্রেণির খাদ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ ধাপে– মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম, ডাল, ছানা ও পনির ইত্যাদিকে একটি খাদ্য শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণির খাদ্য থেকে প্রধানত প্রোটিন পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

পঞ্চম ধাপে– তেল, ঘি ও ফ্যাটজাতীয় খাদ্য এবং চিনি, গুড় ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যকে একটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণির খাদ্য থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। তাই এই খাবারগুলো খুবই কম পরিমাণে খাওয়া উচিত। বেশি খেলে শরীরের ওজন বেড়ে যাবে।

আমরা যদি 'খাদ্য পিরামিড'-এর বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্যগুলো থেকে প্রতিদিনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য নির্বাচন করে গ্রহণ করি তা হলে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী সকল পুষ্টি উপাদান পাওয়া যাবে অর্থাৎ খুব সহজেই আমাদের খাদ্য গ্রহণ সুষম হবে।

কাজ– ১ তুমি প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাও তা কোন কোন খাদ্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা উল্লেখ করো এবং তা খাদ্য পিরামিডের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৪- কৈশোরকালীন পুষ্টির চাহিদা

কৈশোরকালীন সময়ে শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে ফলে পুষ্টির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২-১৫ বছর বয়সে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০-১৩ বছর বয়সে পুষ্টির চাহিদা বেশি থাকে। কৈশোরে বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে।

শক্তি– শারীরিক বৃদ্ধি ও শক্তির খরচ বৃদ্ধির কারণে কৈশোরে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বয়স, পরিশ্রমের প্রকৃতি ও ছেলে-মেয়ে ভেদে শক্তির চাহিদায় তারতম্য ঘটে। ৯ বছর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের শক্তি চাহিদা একই ধরনের থাকে। কিন্তু ১০ বছর বয়স থেকে এই চাহিদার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। এই বয়স থেকেই মেয়েদের চাইতে ছেলেদের শক্তি চাহিদা বেশি হয়। কৈশোরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি বছরই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যে সকল ছেলে-মেয়ে বেশি পরিশ্রম করে অথবা খেলাধুলা বেশি করে তাদের শক্তির চাহিদা কম পরিশ্রমীদের চাইতে বেশি হয়।

কার্বোহাইড্রেট- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদা মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

প্রোটিন- কৈশোরকালীন সময়ে প্রোটিনের চাহিদাও কিছুটা বেশি থাকে, কারণ এই সময়ে দ্রুত গতিতে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে। এই বয়সে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। কৈশোরকালীন সময়ে প্রোটিনের ঘাটতির কারণে বর্ধন ব্যাহত হয়।

ফ্যাট- কৈশোরে শক্তির চাহিদা বেশি থাকে তাই এই বয়সীদের জন্য খাদ্যে ফ্যাটের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে অতিরিক্ত ফ্যাট বহুল খাবার বিশেষ করে 'ফাস্ট ফুড' গ্রহণে শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যেতে পারে। তাই সব সময় ফ্যাট বহুল খাদ্য বা ফাস্ট ফুড গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

খনিজ লবণ- এই বয়সে বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ, জিংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধির জন্য জিংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রক্ত গঠনের জন্য লৌহ প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের লৌহের চাহিদা কিছুটা বেশি হয়। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফল থেকে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

চিত্র– কৈশোরকালে খেলাধুলা বা পরিশ্রমের কারণে পুষ্টির চাহিদা বাড়ে

ভিটামিন- কৈশোরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন এবং নায়াসিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ সময় দ্রুতগতিতে দেহের বৃদ্ধি ঘটায় ও রক্ত গঠনের জন্য ফলিক এসিড, ভিটামিন বি$_{১২}$ ও ভিটামিন বি$_{৬}$-এর চাহিদাও বাড়ে। এছাড়াও দেহের বিভিন্ন কোষের সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-ই প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন-ডি অত্যাবশ্যকীয়। বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি শাক-সবজি ও ফল থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া যায়।

পানি- শরীর সুস্থ রাখার জন্য অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের মতো পানিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। ঘাম, মল ও মূত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায়। এই পানির চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন।

অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, কৈশোরে সকল পুষ্টি উপাদানের চাহিদাই বাড়ে। এই বাড়তি চাহিদা পুরণ না হলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা যেমন– রক্ত স্বল্পতা, রাতকানা, হাড়ের দুর্বল গঠন, লম্বায় ছোট হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দিবে। তাই এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

কাজ– ১ কৈশোরে একজন মেয়ের রক্ত গঠনের জন্য কোন কোন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং কিভাবে তা পূরণ করা যায় দলগত ভাবে চার্ট তৈরি করো।
কাজ– ২ কৈশোরে পুষ্টি চাহিদা পূরণের একদিনের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে কতটুকু কিলোক্যালরি পাওয়া যায়?

ক. ৪ কিলোক্যালরি খ. ৬ কিলোক্যালরি

গ. ৮ কিলোক্যালরি ঘ. ৯ কিলোক্যালরি

২. ডিমের কুসুম থেকে শিশু-কিশোরের–

i . দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয়

ii. রক্তস্বল্পতা রোধ করে

iii. হাড়ের বৃদ্ধি সাধন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

করিম ও রহিম দুই ভাই। করিম রিক্সাচালক, রহিম সারাদিন দোকানে সেলসম্যানের কাজ করে। খেতে বসলে দেখা যায় করিম ও রহিম দুজনই সমান পরিমাণে মাছ, ভাত ও সবজি খাদ্য গ্রহণ করে এবং রহিম সুস্থভাবে দোকানে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. সেলসম্যান রহিমের সুস্থতার কারণ–

ক. স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিহার

খ. চাহিদা ও ক্যালরির সমতা

গ. নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা

ঘ. বিশ্রাম ও কাজের সমতা

৪. যদি করিম একইভাবে খাদ্যগ্রহণ করতে থাকে–

i. ওজন কমতে থাকবে

ii. কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে

iii. স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া সুমা ও কণা দুই বান্ধবী। তাদের দৈহিক গঠন দুই ধরনের। নিম্নে তাদের দৈনিক খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া হলো−

	সুমা	কণা
সকাল	রুটি- ৩টি ডিম- ১টি কলা- ১টি দুধ- ১ কাপ	রুটি- ২টি ডিম- $\frac{১}{২}$ টি কলা- ১টি দুধ- X
দুপুর	ভাত- ২ কাপ মাছ/মাংস- মাঝারি ১ টুকরা সবজি- $\frac{১}{২}$ কাপ সালাদ- ১ কাপ	ভাত- ১$\frac{১}{২}$ কাপ সবজি- $\frac{১}{২}$ কাপ মাছ/মাংস - $\frac{১}{২}$ টুকরা সালাদ- $\frac{১}{২}$ কাপ
রাত	ভাত- ২ কাপ মাছ/মাংস- ২ টুকরা দুধ- ১ কাপ	ভাত- ১ কাপ মাছ/মাংস- ১ টুকরা দুধ- X

করো।

ক. সুষম খাদ্য কী?

খ. খাদ্য পিরামিড বলতে কী বোঝায়।

গ. সুমার দৈনিক খাদ্যাভাস হতে সুমার শারীরিক গঠন সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায় বুঝিয়ে লেখো।

ঘ. কণার খাদ্যাভ্যাস তার সুস্থ দৈহিক বর্ধনে কতটুকু সহায়ক যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করো।

২. জিতু ও রিতু সমবয়সী। জিতু বাড়িতে তৈরি খাবার খেতে প্রায়ই অনীহা প্রকাশ করে। সে দোকান থেকে বিভিন্ন খাবার যেমন : পাউরুটি, স্যান্ডউইচ, চিপস, চানাচুর ইত্যাদি কিনে খায়। অন্যদিকে রিতু ঘরে রান্না করা মাছ, মাংস, শাক-সবজি ও ডাল স্বাচ্ছন্দ্যে খায়। জিতু ও রিতু স্কুলের বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। দেখা যায় জিতু খেলতে গিয়ে অল্পতেই দুর্বল অনুভব করে এবং পড়ালেখায়ও মনোযোগ দিতে পারে না।

ক. খাদ্যের শক্তি পরিমাপের একক কী?

খ. কৈশোরে শক্তির চাহিদা বাড়ার কারণ বুঝিয়ে বলো।

গ. জিতুর দুর্বলতার কারণ কী ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জিতু ও রিতুর খাদ্য তালিকার মধ্যে কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তা বুঝিয়ে লেখো।

একাদশ অধ্যায়

খাদ্যাভ্যাস গঠন

পাঠ ১– খাদ্য গ্রহণে ভ্রান্ত ধারণা ও কুফল

আমরা প্রায়ই 'মাছে ভাতে বাঙালি' এই প্রচলিত কথাটি শুনে থাকি, যা বহুকাল থেকে প্রচলিত বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকেই বোঝায়। বংশপরম্পরায় খাদ্য গ্রহণের ধারাবাহিকতা থেকেই খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে। খাদ্যাভ্যাস অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণত জাতিগতভাবে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটা সাধারণ খাদ্যাভ্যাসের প্রচলন দেখা যায়। যেমন– বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন ব্যবস্থা ভিন্ন এবং তাদের খাদ্য গ্রহণ রীতি ও অভ্যাসও ভিন্ন। এছাড়াও ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপজীবিকা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির ভিন্নতার কারণেও খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস প্রভাবিত হয় ও রীতি নীতিতে ভিন্নতা দেখা দেয়। আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত ছিল বর্তমানে বিভিন্ন কারণে সেই খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। যেমন– ঘরে তৈরি শরবতের পরিবর্তে কোমল পানীয় ও ঘরে তৈরি খাবারের পরিবর্তে ফাস্ট ফুড বা বেকারির খাবার গ্রহণ বর্তমানে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসের উদাহরণ। এই ধরনের পরিবর্তন প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসের ধারাকে পরিবর্তন করছে। এই খাদ্যাভ্যাসের নিয়মিত চর্চা করা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত সুষ্ঠু খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য ছোটবেলা থেকেই সচেতন হতে হবে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য ব্যক্তিগত সচেতনতা প্রয়োজন। যেমন–

- শরীরকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও নীরোগ রাখার জন্য উপযোগী খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা।
- প্রতিদিনের প্রতিবেলার আহার গ্রহণে নির্দিষ্ট সময় বজায় রাখা ও নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা।
- দৈনিক খাদ্য তালিকায় মাছ-মাংস, ডাল, দুধ, মৌসুমি শাক-সবজি ও ফল ইত্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা।
- পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার রান্না ও পরিবেশনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

কাজ- ১ সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের উপায় লেখো।

তাপসী সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। প্রতিদিন নিজের পছন্দমতো মাছ, মাংস না পেলে পেট ভরে খায় না। তার মায়েরও ধারণা পুষ্টিকর খাবার মানেই দামি খাবার। এভাবে সবসময় খাবার বেছে খাওয়ার ফলে তার শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে সে প্রায়ই অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে সুমন ক্লাসের ভালো ছাত্র। সে পরীক্ষা দিতে যাবে। তার দাদু মনে করেন যে পরীক্ষার সময় ডিম খেলে পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয় না। তাই তিনি সুমনকে ডিম খেতে দেন না।

উপরের এই ঘটনাগুলোর মতো অনেক ঘটনাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই, যেগুলোর মূল ভিত্তি হলো কিছু ভুল ধারণা ও বিশ্বাস। এই ধরনের ধারণাগুলোর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নেই। খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলন মাত্র। খাদ্য সম্পর্কিত সঠিক ধারণা না থাকার কারণে আমরা সুষম খাদ্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হই। ফলে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যেমন–

- ডিম খেলে পরীক্ষায় ডিম পাবে বা শূন্য পাবে।
- কলা খেলে ঠান্ডা লাগবে।
- চিনি, গুড়, মিষ্টি খেলে পেটে কৃমি হয়।
- গর্ভবতী মা মৃগেল মাছ খেলে গর্ভস্থ শিশুর মৃগী রোগ হবে, জোড়াকলা খেলে যমজ সন্তান হবে, হাঁসের ডিম খেলে শিশুর গলা ফেসফেসে হবে।

এছাড়াও জ্বর, ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খাওয়া যায় না, কেবল মাত্র দামি খাবার খেলেই সব সময় সুস্থ থাকা যায় ধারণাটি সম্পূর্ণই ভুল। প্রকৃতপক্ষে সঠিক বিষয়টি এর একেবারেই বিপরীত অর্থাৎ জ্বর, ডায়রিয়া হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণের পাশাপাশি সব ধরনের স্বাভাবিক খাবার খাওয়া যায় এবং প্রতিদিন ছোট মাছ, ডাল, হলুদ ও সবুজ শাক-সবজি, দেশীয় মৌসুমি ফল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের সমন্বয়ে যদি সুষম খাবার খাওয়া যায় তাহলেই সুস্থ থাকা যায়।

কাজ- ২ খাদ্য সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত তিনটি ভ্রান্ত ধারণার কুফল শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২- অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিহার, খাদ্যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফল

খাদ্য শরীরকে সুস্থ সবল, কর্মক্ষম ও নীরোগ রাখে। কিন্তু কোনো কারণে খাদ্য যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় বা জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে অস্বাস্থ্যকর খাবার বলা হয়।

যেসব কারণে খাদ্য অস্বাস্থ্যকর হয়–

- খাদ্য জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে।
- খাদ্যে ক্ষতিকর পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত হলে।
- খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্যাদি যেমন– ধুলাবালি, ইট, পাথর ইত্যাদি মিশ্রিত হলে।
- খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত পানি, তেল, মসলা, বিভিন্ন উপকরণ বিশুদ্ধ না হলে বা ভেজাল হলে।
- খাদ্য প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থতা না থাকলে।
- খাদ্য রান্না, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের স্থান, ব্যবহৃত তৈজসপত্র ইত্যাদি দ্বারা খাবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের নাম-

- স্কুলের সামনে, রাস্তাঘাটের পাশে, ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে করে খোলা অবস্থায় বিক্রি করা খাবার। যেমন- ঝালমুড়ি, ফুচকা, আচার, চটপটি, আইসক্রিম ইত্যাদি।

- রাস্তার পাশে অস্থায়ী খোলা রেস্তোরাঁয়, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে যেসব খাবার পাওয়া যায় যেমন– পরটা, শিঙ্গাড়া, সমুচা, ডালপুরি ইত্যাদি।

- অনুমোদনহীন, পুষ্টি গুণহীন, ঝুঁকিপূর্ণ রঞ্জক উপাদান ও রাসায়নিক উপাদান সংবলিত খাবার। যেমন- জুস,পানীয়, চকোলেট, কেক, বিস্কিট ইত্যাদি।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় যে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের রোগের সম্পর্ক আছে। যেমন– ডায়রিয়া, পেটের সমস্যা, হেপাটাইটিস, আমাশয়, টাইফয়েড, কিডনির সমস্যা, চর্ম রোগ ইত্যাদি। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কাজ- ১ খাদ্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠার ৪টি কারণ লেখো।

খাদ্যে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের কুফল-

খাদ্যকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য অনেক সময় স্বাস্থ্যসম্মত ফুডগ্রেড কালার ব্যবহার করা হয়। খাদ্যে ব্যবহৃত এইসব প্রকৃত ফুডগ্রেড কালার বেশ দামি। কিন্তু কিছু কিছু ব্যবসায়ী খাদ্যের উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন কৃত্রিম ও রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত সস্তা রং ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ফুডগ্রেড কালারের পরিবর্তে টেক্সটাইল ডাই কিংবা লেদার ডাইয়ের মতো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন– খাবারের রং উজ্জ্বল করে উন্নত করার জন্য খুব সামান্য পরিমাণে খাওয়ার রং (ফুডগ্রেড কালার) ব্যবহার করা যায়। যেমন– লেমন স্কোয়াস, পাইন অ্যাপেল স্কোয়াস, গ্রিন ম্যাংগো স্কোয়াস। বিভিন্ন ধরনের জুস তৈরিতে সামান্য রং দিলে এর ফ্যাকাসে ভাব দূর হয়। কিন্তু বিভিন্ন কৃত্রিম ও রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত সস্তা রং খাবারে কোনোভাবেই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এগুলো শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিকভাবে খাদ্যে যে রং থাকে তাই আমাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী। কৃত্রিম রংযুক্ত ক্রিম, ফল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো খাবার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। রাস্তাঘাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বেকারি, দোকান, ভ্যান গাড়ি ইত্যাদি স্থানে যে সব কৃত্রিম রংযুক্ত বিভিন্ন খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো পরিহার করাই স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।

কৃত্রিম রংযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে– বদহজম, ডায়রিয়া, চামড়ার সমস্যা, দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন– লিভার ও কিডনির রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

কাজ- ২ রং ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি খাবারের নাম তালিকা করো।

পাঠ ৩ - ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কুফল, ফাস্ট ফুডের অপকারিতা

আমরা বাজার থেকে কাঁচা কিংবা রান্না করা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কিনে আনি। এই খাবারগুলোর মধ্যে অনেক সময় খাদ্য নয় এমন সব দ্রব্যাদি মেশানো হয়, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেমন- কৃত্রিম রং, পচনশীলতা রোধক রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্যের ওজন বাড়ানোর জন্য ইটের টুকরা, পাথরের টুকরা, বালি ইত্যাদি। এছাড়াও খাদ্যের রং আরও সাদা করার জন্য এবং অপরিপক্ব ও কাঁচা ফল দ্রুত পাকানোর জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। খাদ্য নয় এমন সব দ্রব্যাদিকে ভেজাল দ্রব্যাদি বলা হয় এবং এই ভেজাল দ্রব্যাদি মিশ্রিত খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য বলা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য খাদ্যের মধ্যে এই সকল দ্রব্যাদি অর্থাৎ ভেজাল দ্রব্যাদি অবাধে মিশ্রিত করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। যা খেয়ে মানুষ নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যের মধ্যে যেসব ভেজাল দ্রব্যাদি মেশানো হয়-

- কাঁচা মাছ, পাকা ফল, সতেজ রাখতে ফরমালিন।
- দুধ, চিনি ইত্যাদিতে সাদা ভাব আনার জন্য হাইড্রোজ।
- অপরিণত ফলমূল পাকানোর জন্য কার্বাইড।
- মুড়ি আরও সাদা করার জন্য ও আকার বড় ও সুন্দর করার জন্য ইউরিয়া।
- গুঁড়া মশলার মধ্যে কৃত্রিম রং, ইটের গুঁড়া ইত্যাদি।
- ভাজার জন্য পাম অয়েল, পশুর চর্বি কিংবা অন্য গলনশীল চর্বি ব্যবহার।
- চিকেনফ্রাই-এর জন্য ব্যবহৃত হয় রোগাক্রান্ত বা মৃত মুরগি।
- মাখন-মেয়নেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় অপরিশোধিত সস্তা চর্বি।
- শুঁটকী মাছে ডি ডি টি।
- মাংসের কিমা হিসেবে গরু ছাগলের অব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট অংশ, নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার।

ভেজাল মেশানো এসব খাবার দেখে আমরা আকৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এসব খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়রিয়া, বদহজম, বমি, চর্মরোগ, কিডনি ও লিভারের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি এমনকি ক্যানসারের মতো মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীর রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হয়।

ফাস্ট ফুডের অপকারিতা

ফাস্ট ফুড তৈরির প্রায় সব উপকরণ আগে প্রস্তুত করা থাকে। খাওয়ার সময় দ্রুত তৈরি ও পরিবেশন করা হয়। যেমন বার্গার তৈরির জন্য মাংসের পুর আগেই প্রস্তুত করা থাকে। খাওয়ার আগে ভেজে বার্গার প্রস্তুত করা হয়। ফাস্ট ফুডকে হট ফুড বা জাঙ্ক ফুডও বলা হয়। কয়েকটি ফাস্ট ফুডের নাম হলো– বিভিন্ন ধরনের বার্গার, স্যান্ডউইচ, শর্মা, ফ্রাইড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইড, পিজ্জা, হট ডগ, নানরুটি, কাবাব, ফালুদা, ফুচকা, আইসক্রিম, কোমল পানীয়, লাচ্ছি ইত্যাদি।

ফাস্ট ফুড যেসব কারণে অস্বাস্থ্যকর হয়

- ভাজার কাজে যে তেল ব্যবহার করা হয় তা যদি বার বার ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে বিষাক্ত (টক্সিক) পদার্থ তৈরি হয়।
- ব্যবহৃত কাঁচামাল যেমন– ময়দা, মসলা, রং ইত্যাদি বিশুদ্ধ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন না হলে।
- বেঁচে যাওয়া পচা, বাসি উপকরণ বার বার ব্যবহার করা হলে।
- খাদ্য প্রস্তুত করার স্থান ও প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা না হলে।
- খাদ্য পরিবেশনের সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত না হলে।
- রন্ধন স্থানের পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকলে।

ফাস্ট ফুডের সাথে কোমল পানীয়, আইসক্রিম, লাচ্ছি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। কোমল পানীয়তে কার্বনেটেডের মাত্রা বেশি হওয়ায় এবং আইসক্রিমে ব্যবহৃত দুধ, এসেন্স ও রং (খাদ্যের সুগন্ধি দ্রব্য এবং ফুড কালার) ইত্যাদির বিশুদ্ধতার অভাব শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

নিয়মিত ফাস্ট ফুড খেলে নিম্নরূপ স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়-

- ওজন বৃদ্ধি পায়।
- বুক জ্বালাপোড়া করে।
- বদহজম হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির প্রভাব সৃষ্টি হয়।
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানিবাহিত রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

কাজ– ১ ফাস্ট ফুডের অপকারিতা সম্পর্কে লেখো।

পাঠ ৪- বিকল্প খাদ্য, স্বাস্থ্য রক্ষায় শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম

আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন খাবার গ্রহণ করি। অনেক সময় অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সেই সব প্রচলিত খাবার গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন আমাদেরকে প্রচলিত খাবারের পরিবর্তে অন্য খাবার গ্রহণ করতে হয়। যেমন– ভ্রমণকালীন সময় ভাতের পরিবর্তে আলাদা বিভিন্ন ধরনের শুকনা খাবার খাওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভূমিকম্প হলে তখন জীবনের স্বাভাবিক গতিশীলতা থাকে না। দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাভাবিক রান্না খাওয়া তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে যেসব খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করা হয়, সেগুলোই হচ্ছে বিকল্প খাদ্য। যেমন– চিড়া, মুড়ি, চাল ভাজা, মোয়া, গুড়, বিস্কুট, খেজুর ইত্যাদি।

যেকোনো অবস্থায় পানীয় জল ছাড়া চলে না। তাই বোতলজাত বিশুদ্ধ পানীয় জল, ডাব, নারিকেলের পানি অন্যতম বিকল্প খাদ্য। আবার ঝড়, বন্যার সময় পানি ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করার পরিবর্তে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি ব্যবহার করে বিশুদ্ধ পানির বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কাজ- ১ বিকল্প খাদ্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন লেখো।

শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম

আমরা খাদ্যের মাধ্যমে শক্তি পাই। বিভিন্ন কাজ করে এই শক্তি আবার খরচ করি। বেশি পরিশ্রমের কাজ করলে শক্তি বেশি খরচ হয়। যেমন– দৌড়ানো, ফুটবল খেলা ইত্যাদিতে শক্তি বেশি খরচ হয়। আবার হালকা কাজ করলে অর্থাৎ গল্পের বই পড়া, টিভি দেখা, বই গোছানো ইত্যাদি কাজে শক্তি কম খরচ হয়। শক্তির খরচ যখন খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণকৃত শক্তির সমান হয়, তখন শরীরের ওজন ঠিক থাকে, আবার শক্তির খরচের চাইতে খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণকৃত শক্তি বেশি হলে শরীরের ওজন বেড়ে যায়। যারা পরিশ্রমের কাজ করেন না তারা খেলাধুলা বা ব্যায়াম করে শরীরের বাড়তি শক্তি জমার প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারেন।

নিয়মিত পরিশ্রম/ব্যায়াম/খেলাধুলা করার উপকারিতাগুলো–

- ঘুম ভালো হয়।
- ক্ষুধা যথাযথ থাকে।
- ওজন স্বাভাবিক থাকে।
- পেশির সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- শিশুদের দৈহিক গঠন সুদৃঢ় হয়।
- মন প্রফুল্ল থাকে।
- কর্ম উদ্দীপনা বজায় থাকে।
- ওজনাধিক্যের ফলে সৃষ্ট রোগের ঝুঁকি কম থাকে।

কয়েকটি শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম-

- পায়ে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত।
- সাঁতার কাটা/ অন্যান্য ব্যায়াম।
- সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা।
- দৈনন্দিন কাজগুলো নিজে করা।
- বাগান করা।
- ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলা।

কাজ- ২ তোমার জন্য উপযুক্ত তিনটি শারীরিক শ্রম ও ব্যায়াম উল্লেখ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পানি বিশুদ্ধ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ফিটকিরি
খ. কার্বোহাইড্রেট
গ. হাইড্রোজ
ঘ. ইউরিয়া

২. কোনটি বিকল্প খাদ্য?

ক. ভাত, ভর্তা
খ. খিচুড়ি, ডিমভাজা
গ. দুধ, রুটি
ঘ. মুড়ি, গুড়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুনন্দার ভাইয়ের বয়স ৯ মাস। ইদানীং তার বর্ধন ভালো হচ্ছে না। প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত তার বর্ধন ভালোভাবেই হচ্ছিল। ৬ মাসের পর সুনন্দার মা বাচ্চাকে খিচুড়ি খাওয়াতে চাইলে সুনন্দার দাদি বাধা দিয়ে বলেন, "খিচুড়ি খেলে বাচ্চার পেট বড় হয়ে যাবে।"

৩. সুনন্দার দাদির মন্তব্যটি কী?

ক. অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা
খ. প্রচলিত অযৌক্তিক ধারণা
গ. বিজ্ঞানসম্মত ধারণা
ঘ. অভিজ্ঞতালব্ধ অপ্রচলিত ধারণা

৪. সুনন্দার ভাইয়ের বর্ধন ভালো না হওয়ার কারণ–

i. প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব
ii. পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব
iii. সুষম খাদ্যের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দীপক প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আচার, চাটনি, কেক, হাওয়াই মিঠাই, আইসক্রিম ইত্যাদি কিনে খায়। বাসায় ফিরে সে দেরি করে ভাত খায়। ইদানীং সে ঘন ঘন ডায়রিয়ায় ভোগে।

ক. অসাধু ব্যবসায়ীরা অপরিণত ফল পাকাতে কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে?

খ. ভেজাল খাদ্য বলতে কী বোঝায়?

গ. দীপকের ডায়রিয়ায় ভোগার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দীপক যে ধরনের খাবার খেয়ে থাকে তাতে ব্যবহৃত পদার্থ দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়ক। বিশ্লেষণ করো।

২. ত্রপার বয়স ১৪ বছর। প্রতিদিন সে নাস্তা না খেয়ে স্কুলে যায়। টিফিনে শর্মা, বার্গার কোল্ড ড্রিংকস, আইসক্রিম ইত্যাদি খেয়ে থাকে। দুপুরের খাবার খেতে খেতে তার বিকেল হয়ে যায়। সে বয়স অনুপাতে মোটা হয়ে গেছে। তার বুক জ্বালাপোড়ার সমস্যাও দেখা যাচ্ছে।

ক. কোন ধরনের কাজ করলে বেশি শক্তি খরচ হয়?

খ. বিকল্প খাদ্য বলতে কী বোঝায়?

গ. ত্রপার শারীরিক সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ত্রপার খাদ্যাভ্যাসই ত্রপার শারীরিক সমস্যার জন্য দায়ী বুঝিয়ে লেখো।

ঘ বিভাগ

বস্ত্র ও পরিচ্ছদ

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা–এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে বস্ত্রের স্থান অন্যতম। বস্ত্র তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের তন্তু থেকে। নানা ধরনের উৎস থেকে প্রাপ্ত বয়ন তন্তুর বৈশিষ্ট্যও নানা ধরনের হয়ে থাকে। বিভিন্ন বয়ন তন্তু বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী। আমাদের জীবনে বস্ত্রের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

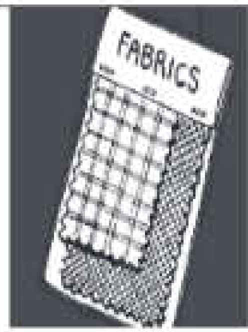

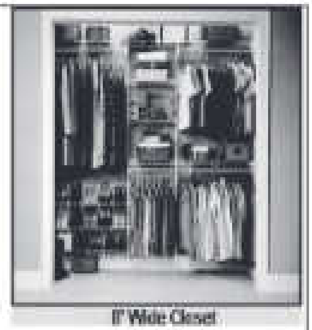

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- বস্ত্র ও পরিচ্ছদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পোশাকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- তন্তুর গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তন্তুর শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
- পোশাকের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মৌসুমি যত্ন নিতে পারব।
- আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে পোশাক-পরিচ্ছদ সংরক্ষণ করতে পারব।
- সেলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারব।
- নির্দিষ্ট আকারের কাপড়ে টাক, রান, হেম, বখেয়া ইত্যাদি স্টিচ প্রদান করতে পারব।

দ্বাদশ অধ্যায়

বস্ত্র ও পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা

পাঠ ১- বস্ত্র ও পরিচ্ছদ

আমরা সবাই যে পোশাক পরিধান করে আছি, তা যে কাপড় থেকে প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলে ফেব্রিক বা বস্ত্র। পোশাক পরিধানের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্র সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– ওভেন ফেব্রিক ও নিটেড ফেব্রিক।

ওভেন ফেব্রিক

তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক সেট সুতা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে এবং আরো এক সেট সুতা আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র বোনা হয়। লংক্লথ, ভয়েল, পলিয়েস্টার, অর্গ্যান্ডি, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি হচ্ছে ওভেন ফেব্রিকের উদাহরণ।

নিটেড ফেব্রিক

হাতে বা মেশিনে নিটিং প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে একটি সুতার লুপ বা ফাঁসের মধ্য দিয়ে আরও একটি ফাঁস তৈরি করে বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। নিটেড ফেব্রিকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টি-শার্টের কাপড়, হোসিয়ারির কাপড় ইত্যাদি।

ওভেন ফেব্রিকের বস্ত্র

নিটেড ফেব্রিকের বস্ত্র

যে প্রক্রিয়ায়ই বস্ত্র উৎপন্ন করা হোক না কেন পোশাক পরিচ্ছদ তৈরিতে ব্যবহৃত বস্ত্রের মধ্যে কিছু গুণাবলি থাকতে হবে। তোমরা কি বলতে পারবে কোন ধরনের গুণাবলি থাকলে বস্ত্রটি পোশাকের উপযোগী হবে?

নিচে এ ধরনের বস্ত্রের কয়েকটি গুণাবলি উল্লেখ করা হলো–

- একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকতে হবে।
- গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হবে।
- শক্ত ও মজবুত হতে হবে।
- পরিধানে আরামদায়ক হতে হবে।
- টেকসই হতে হবে।
- উজ্জ্বল ও মসৃণ হতে হবে।
- জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে।
- তাপ সহনশীল হতে হবে।
- সুন্দরভাবে ঝুলে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত এই বস্ত্রকে ছেঁটে পরিধান ও ব্যবহার উপযোগী যা কিছু তৈরি করা হয় তাই হচ্ছে পরিচ্ছদ। অর্থাৎ তোমরা চুলের ফিতা থেকে পায়ের জুতা পর্যন্ত যা কিছু পরিধান করে আছ তা-ই পরিচ্ছদ।

বস্ত্র

পরিচ্ছদ

বিভিন্ন ধরনের পরিচ্ছদ তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র প্রয়োজন হয়। যেমন– সালোয়ার, কামিজ, শার্ট মূলত তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্ত্র থেকে তৈরি করা হয়, অন্যদিকে নিটিং প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্ত্র থেকে তৈরি করা হয় গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি।

কাজ- ১ বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের টুকরা সংগ্রহ করে কোনটি কোন ধরনের বস্ত্র তা দলগতভাবে নির্ণয় করো।

কাজ- ২ তোমার কোন কোন ফেব্রিকের তৈরি পোশাক আছে তা শনাক্ত করে একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২- পোশাকের প্রয়োজনীয়তা

তোমরা গল্প পড়ে বা ছবি দেখে জেনেছ যে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিধানের উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। যে সব কারণে মানুষ পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

শালীনতা রক্ষা– সভ্য সমাজে লজ্জা নিবারণ ও শালীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই মানুষ পোশাক পরে। এই শালীনতা রক্ষার জন্য মানুষ স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে আসছে। এ কারণেই ইসলামিক পোশাকের সাথে জাপানিজ পোশাক কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পোশাকের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

ইসলামিক পোশাক

বৌদ্ধদের পোশাক

জাপানিজ পোশাক

স্বাস্থ্যরক্ষা– স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাইরের ধুলাবালি, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগ-জীবাণুর হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা পোশাক পরিধান করি। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক সময় আমরা সাধারণ পোশাকের সাথে রুমাল, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, মাস্ক, এপ্রোন ইত্যাদিও ব্যবহার করি।

আরামপ্রদান– তোমরা জানো বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাই দেহকে আরাম প্রদানের জন্য বিভিন্ন ঋতুতে যেমন শীতকালে গরম পশমি পোশাক; গ্রীষ্মকালে ঢিলেঢালা হালকা পোশাক এবং ঝড়-বৃষ্টির সময় বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয়।

গ্রীষ্মকালীন পোশাক

বর্ষার পোশাক

পশমি পোশাক

পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদা– নিজ পেশা ও পরিচিতি সমাজে তুলে ধরার জন্য নানা ধরনের পোশাক পরতে হয়। তাই ডাক্তার, সৈনিক কিংবা নার্সদের পোশাক দেখলেই তাদের পেশা বোঝা যায়। খেলোয়াড়দের পোশাকের রং ও ডিজাইন দেখলেও দল শনাক্ত করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোশাক দেখলেও সে দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

নার্সদের পোশাক	সৈনিকদের পোশাক	ডাক্তারদের পোশাক

আত্মরক্ষা– প্রাচীনকালের মানুষেরা নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পশু-প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেহে আচ্ছাদন ব্যবহার করত। পরবর্তীতে মানুষ বাইরের আঘাত ও অনিষ্ট থেকে দেহকে নিরাপদে রাখার জন্য পোশাক পরিধান করে। যেমন– কলকারখানার শ্রমিকরা বিশেষ ধরনের পোশাক, হেলমেট ও জুতা পরিধান করে; নার্স, ডাক্তার ও রসায়নবিদরা রোগ-জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য নিরাপত্তামূলক পোশাক যেমন- এপ্রোন, মাস্ক ও দস্তানা পরে; অগ্নি প্রতিরোধক সংস্থার কর্মীরা গায়ে যেন আগুন না লাগে সেজন্য এসবেসটস তন্তুর তৈরি পোশাক পরে; সৈনিকরা বুলেট প্রতিরোধক জ্যাকেট গায়ে দেয়; খেলোয়াড়রা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিরাপত্তামূলক পোশাক ও আনুষঙ্গিক সজ্জা পরে; শিকারিরা আঁটসাঁট লম্বা প্যান্ট, ফুলশার্ট ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জুতা, মাথায় হ্যাট পরে; ডুবুরিরা ভাসমান জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট ব্যবহার করে।

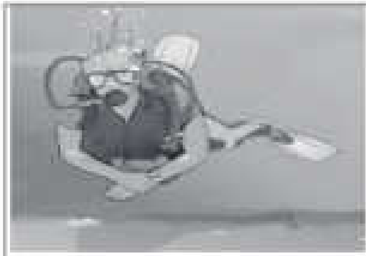	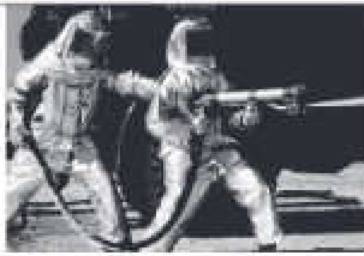	
ডুবুরির পোশাক	অগ্নিপ্রতিরোধক সংস্থার কর্মীর পোশাক	শিকারির পোশাক

৬. **সৌন্দর্য প্রকাশ-** পোশাক হচ্ছে এমন একটি উপকরণ, যার মাধ্যমে ব্যক্তি খুব সহজেই নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নির্বাচনটি সঠিক হতে হবে। সময় ও স্থান বুঝে মানানসই পোশাক পরলে ব্যক্তির সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।

কাজ- ১ আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত তার একটি চার্ট দলগতভাবে উপস্থাপন কর।

কাজ- ২ ছকের মাধ্যমে দেখাও যে কোন ঋতুতে কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয়।

পাঠ ৩- পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস

তোমরা কি বলতে পারবে পোশাক কবে সৃষ্টি হয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে কবে, কখন পোশাকের উৎপত্তি হয় তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দেহে আচ্ছাদন ব্যবহার করে আসছে। আদিমযুগের মানুষেরা দেহে গাছের বাকল, পাতা, প্রাণীর চামড়া, পালক, অলংকার ইত্যাদি আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত। সে যুগের মানুষেরা চামড়ার সাথে সংযুক্ত পা বা খুর দুটো গলার পেছন দিকে বেঁধে বুক ও পিঠ ঢেকে রাখত। চামড়া বড় হলে খুরগুলো গলা ও কোমরের কাছে এনে গিঁট দিয়ে রাখত। এ ধরনের ব্যবস্থা সুবিধাজনক ছিল না, প্রায়ই খুলে যেত।

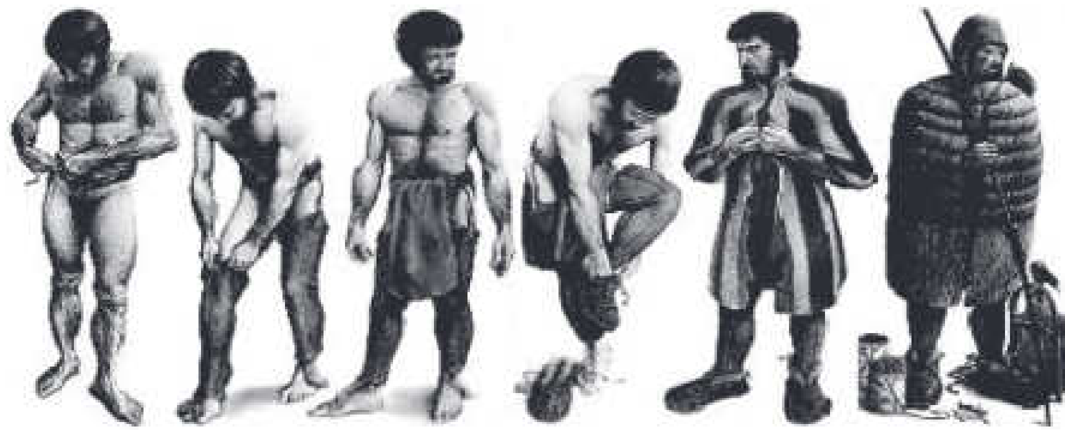

পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস

ধীরে ধীরে মানুষ সেলাই করার কৌশল আবিষ্কার করে। মৃত পশুর শুকনো রগ দিয়ে সুতা এবং চিকন হাড় থেকে সুচ অবিষ্কার করে চামড়া সেলাই করে দেহ আচ্ছাদন করে। এরূপ পোশাক বেশ নিরাপদ ছিল। দেহে সেঁটে থাকত এবং খুলে যেত না। এর পর মানুষ শীত, গরম, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য চামড়া সেলাই করে তাঁবু তৈরি করে। পরবর্তীতে চামড়া আরো প্রক্রিয়াজাত করে আরামদায়ক, উন্নত ও স্থায়ী পোশাক তৈরি করতে সক্ষম হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদর্শন থেকে দেখা গিয়েছে যে, প্রাচীনকালে চরকার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ সে যুগেও সুতা কেটে মানুষ বস্ত্র তৈরি করত। তবে দেখা গিয়েছে যে, তখন বস্ত্রের জন্য মানুষেরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এরপর একসময় মানুষ প্রাকৃতিক উদ্ভিদ আঁশ, প্রাণীর চুল বা লোম, গুটিপোকার লালা ইত্যাদি থেকে সুতা বানিয়ে সেই সুতা দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে বস্ত্র তৈরি করে এবং উক্ত বস্ত্র ছেঁটে পোশাক সেলাই করা শুরু করে।

তোমরা খেয়াল করবে যে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক যন্ত্রপাতি, কলকারখানার আবিষ্কার হয়। ফলে শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থাকার জন্য মানুষ প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে অথবা এককভাবে রাসায়নিক উপাদান থেকে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করে এবং ঐ সুতা দিয়ে বস্ত্র বানিয়ে নানা ধরনের পোশাক বানাতে সক্ষম হয়। মানুষ যেহেতু সৌন্দর্যের অনুসারী তাই পোশাকের প্রতি মানুষের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর এ কারণেই বস্ত্র উৎপাদনে যেমন বৈচিত্র্য আসছে, তেমনি পোশাকের ডিজাইনেও নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। তবে দেশ, কাল, ধর্মভেদে এই ডিজাইনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

> কাজ- ১ প্রাচীনকালের মানুষেরা পোশাক তৈরির জন্য কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আদিম কালে কী দিয়ে সুচ ও সুতা তৈরি করা হতো?

ক. লোহা ও তুলা খ. লোহা ও রগ

গ. হাড় ও রগ ঘ. ডাল ও পাতা

২. কোন ধরনের বস্ত্রের পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি থাকে-

ক. ওভেন ফেব্রিক খ. নিটেড ফেব্রিক

গ. নেটিং ফেব্রিক ঘ. ফেল্টিং ফেব্রিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মলি ও জলি দুই বান্ধবী গ্রীষ্মের দুপুরে বান্ধবীর বাবার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যায়। মলি পরেছিল হালকা আকাশী রঙের শাড়ি আর জলি পরে গাঢ় কমলা রঙের রেয়ন শাড়ি।

৩. পোশাক নির্বাচনে মলি যত্নশীল ছিল-

i. সময়ের দিকে

ii. সৌন্দর্যের প্রতি

iii. অনুষ্ঠানের প্রকৃতির প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. জলির নির্বাচিত পোশাকটি-

ক. অনুষ্ঠানের সাথে বেমানান খ. অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক

গ. সঠিক রুচি বোধের পরিচায়ক ঘ. সঠিক রং নির্বাচনের পরিচায়ক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একদিন সোভা বান্ধবী রেবার বাসায় যাবে বলে নরম, আরামদায়ক ও ঢিলাঢালা পোশাক ইস্ত্রি করে। সোভা বান্ধবীর বাসায় পৌঁছানোর পর গল্প করতে যেয়ে বান্ধবী রেবা সোভাকে বলল, জামাটা ইস্ত্রি করিসনি? কেমন যেন কুঁচকে গেছে। উত্তরে সোভা বলে কাপড়টি ইস্ত্রি করেছি, তারপরও এ অবস্থা। রেবা বলে আমার জামাটা কিন্তু কুঁচকায় না, শোষণ ক্ষমতা বেশি।

ক. মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা কয়টি?

খ. নার্সরা আত্মরক্ষার জন্য কী ধরনের পোশাক পরিধান করে বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকে সোভার পরিধেয় বস্ত্রটি কোন ধরনের– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সোভা ও রেবার পরিধেয় কাপড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলক আলোচনা করো।

২. ৭ বছর বয়সী রাহাত বাসায় বসে টেলিভিশনে খেলা দেখছিল। খেলোয়াড়দের নীল ও হলুদের পোশাকের মাঝে ফুটবলের ছবি দেখে রাহাত বলে বাবা ব্রাজিলের খেলা। রাহাতের বাবা জিজ্ঞাসা করল কিভাবে বুঝলে। সে বলে জার্সি দেখে। রাহাতের বাবা জিজ্ঞাসা করল বাংলাদেশের খেলোয়াড় চিনবে কিভাবে? রাহাত বলল কেন লাল-সবুজ জার্সি দেখেই। রাহাতের বাবা তখন বলেন পৃথিবীর সব দেশের পোশাক দেখলে সেই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা জানা যায়।

ক. নিটেড ফেব্রিক কী?

খ. আত্মরক্ষা কী? বুঝিয়ে বলো।

গ. পোশাকের প্রয়োজনীয়তার কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে রাহাত খেলোয়াড়কে শনাক্ত করতে পেরেছে?

ঘ. যেকোনো দেশের খেলোয়াড়দের পোশাক সেই দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বয়ন তন্তুর ধারণা

পাঠ ১- সুতা তৈরির উপযোগী আঁশ বা তন্তুর গুণাবলি

আমরা সবাই জানি, আমরা যে পোশাক পরিধান করি তা তৈরি হয় বস্ত্র থেকে। আপাতদৃষ্টিতে তোমাদের মনে হতে পারে যে, সুতা থেকে এই বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। কথাটি সঠিক হলেও দেখা গিয়েছে যে, এই সুতা আবার তৈরি হয় কতকগুলো ছোট ছোট আঁশ থেকে। অনেক সময় এই ছোট ছোট আঁশ থেকেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত যেসব তন্তুর নাম তোমরা সাধারণত শুনে থাকবে তাদের মধ্যে রয়েছে- তুলা তন্তু, পাট তন্তু, রেশম তন্তু, পশম তন্তু, রেয়ন তন্তু, নাইলন তন্তু ইত্যাদি।

তুলা তন্তু

পাট তন্তু

নাইলন তন্তু

কাজেই তোমরা বলতে পার যে, পোশাক, বস্ত্র বা সুতা তৈরির উপযোগী আঁশগুলোকেই বলা হয় বয়ন তন্তু।

আঁশ বা বয়ন তন্তু ⇨

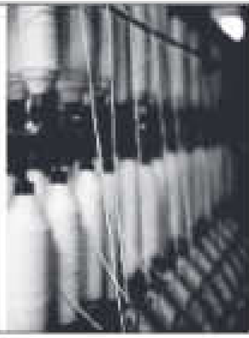
সুতা ⇨

বস্ত্র ⇨

পোশাক

কাজ- ১ বয়ন তন্তু থেকে বস্ত্র তৈরির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি চার্ট তৈরি করো।

বয়ন তন্তুর গুণাবলীগুলো হচ্ছে–

- বয়ন তন্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বড় হবে। তন্তু যত সূক্ষ্ম হবে, বস্ত্র ততই মসৃণ ও নমনীয় হবে।
- বয়ন তন্তুর পর্যাপ্ত শক্তি থাকতে হবে। কারণ শক্তি না থাকলে এ ধরনের আঁশ দিয়ে সুতা বা বস্ত্র তৈরি করা যাবে না।
- সুতা বা বস্ত্র যেহেতু পেঁচিয়ে বা ভাঁজ করে রাখতে হয় তাই বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বয়ন তন্তুতে পাক বা মোচড় দিয়ে সুতা তৈরি করা যায়।
- ছোট ছোট আঁশগুলোর একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকার প্রবণতা থাকতে হবে।
- তন্তুগুলো ভাঁজ করা বা মোচড়ানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- বয়ন তন্তুর মধ্যে নিজস্ব উজ্জ্বলতা থাকবে।
- আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।
- বয়ন তন্তুকে স্থিতিস্থাপক হতে হবে, অর্থাৎ টানলে বড় হবে, ছেড়ে দিলে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে।

কাজ- ১ কী কারণে যে কোনো প্রকার আঁশকে আমরা বয়ন তন্তু বলতে পারি না তা উল্লেখ করো।

পাঠ ২- তন্তুর শ্রেণিবিভাগ

তোমরা আগের পাঠে জেনেছ যে, বস্ত্র তৈরি হয় তন্তু থেকে। প্রকৃতিতে পোশাক তৈরির উপযোগী বিভিন্ন ধরনের তন্তু ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে নানা ধরনের তন্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে তন্তুর শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এর ফলে একই শ্রেণিভুক্ত তন্তুগুলোর যত্ন, গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

উৎস অনুসারে বয়ন তন্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **প্রাকৃতিক তন্তু-** তোমরা প্রকৃতিতে যেসব বয়ন তন্তু দেখতে পাবে তাই হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তু। এদের মধ্যেও শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন-

ক) **উদ্ভিজ্জ তন্তু-** উদ্ভিদের বীজ, বাকল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি থেকে উদ্ভিজ্জ তন্তু পাওয়া যায়। যেমন- কার্পাস গাছের বীজের বাইরের আঁশ থেকে তুলা তন্তু, পাট গাছের বাকল থেকে পাট তন্তু, ফ্ল্যাক্স গাছের কাণ্ড থেকে ফ্ল্যাক্স তন্তু, আনারসের পাতা থেকে পিনা তন্তু পাওয়া যায়।

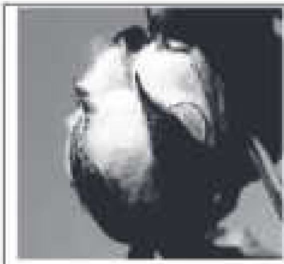
কার্পাস বীজ

ফ্ল্যাক্স গাছ

পাট গাছ

আনারসের পাতা

খ) **প্রাণিজ তন্তু-** প্রাণীর চুল, লোম কিংবা লালা থেকে প্রাণিজ তন্তু পাওয়া যায়। যেমন- ভেড়ার লোম থেকে উল বা পশম তন্তু এবং গুটি পোকার লালা থেকে পাওয়া যায় রেশম তন্তু।

ভেড়ার লোম থেকে পশম তন্তু

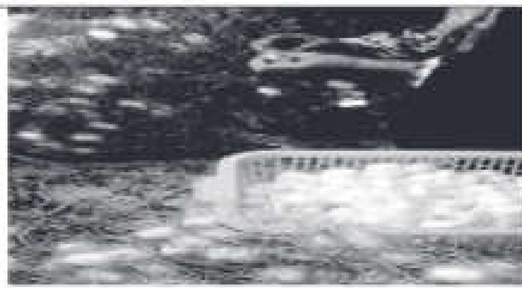
গুটি পোকার লালা থেকে রেশম তন্তু

গ) **খনিজ তন্তু-** মাটির নিচের কঠিন শিলার স্তরে স্তরে এ ধরনের তন্তু পাওয়া যায়। খনিজ তন্তুকে পরিশোধিত করে সুতা উৎপাদন করা হয়। যেমন- এসবেসটস তন্তু থেকে উৎপাদন করা হয় এসবেসটস সুতা।

এসবেসটস তন্তু

এসবেসটস সুতা

ঘ) রাবার তন্তু– প্রাকৃতিক রাবারকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংকোচন করে বিভিন্ন প্রকার তন্তু ও সুতা তৈরি করা হয়।

২। কৃত্রিম তন্তু– তোমাদের জানা দরকার যে, অনেক তন্তু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়নি, মানুষ প্রাকৃতিক তন্তুর সাথে রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কিংবা শুধু রাসায়নিক দ্রব্য থেকে অনেক তন্তু তৈরি হয়, যাদেরকে কৃত্রিম তন্তু বলে। যেমন– নাইলন, রেয়ন ইত্যাদি।

নাইলন তন্তু

রেয়ন তন্তু

কাজ ১। নিচের ছকের বাম দিকের কলামে বিভিন্ন শ্রেণির তন্তুর নাম দেওয়া আছে। প্রত্যেকের বিপরীতে ডান দিকের কলামে উক্ত শ্রেণির উদাহরণ উল্লেখ করে ছকটি পূরণ করো।

বিভিন্ন শ্রেণির তন্তু	উদাহরণ
উদ্ভিজ্জ তন্তু	
প্রাণিজ তন্তু	
খনিজ তন্তু	
কৃত্রিম তন্তু	

পাঠ ৩- তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য

যেহেতু আমাদের জীবনে বস্ত্রের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোন বস্ত্র কী ধরনের তন্তু দিয়ে তৈরি এবং সেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য কী সে সম্পর্কে আমাদের সকলের জানা দরকার। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য কী? ভৌত বৈশিষ্ট্য বলতে তন্তুর আকার, শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা, আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ইত্যাদি বোঝায়। অন্যদিকে কর্ম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তন্তুটির কার্যকরী দিক অর্থাৎ তন্তুটিকে বাস্তবজীবনে কী কাজে লাগানো যেতে পারে তাই হচ্ছে তার কর্ম বৈশিষ্ট্য। নিচে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো। পরবর্তী ক্লাসে এ সম্পর্কে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে।

তুলা তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য– কার্পাস গাছের বীজ থেকে তুলা তন্তু সংগ্রহ করা হয়। এদের উজ্জ্বলতা কম। টানলে বাড়ে না। বেশ শক্ত, ভিজলে এদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এই তন্তুর মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল করতে পারে এবং এরা ভালো আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। তুলা তন্তু থেকে সুতি বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। প্রতিদিনের পোশাক ছাড়াও উৎসবের পোশাক, খেলার পোশাক, পর্দা, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরিতে সুতি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

পর্দা, বালিশের কভারে সুতি বস্ত্রের ব্যবহার

ফ্ল্যাক্স তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য-

ফ্ল্যাক্স তন্তুটি মসিনা গাছের কাণ্ড থেকে সংগ্রহ করা হয়। মসিনা গাছের উপরের ছালটি সরিয়ে নিলে এই তন্তুটি গাছের মাথা থেকে শিকড় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই তন্তুর তৈরি লিনেন বস্ত্র উজ্জ্বল, শক্ত, মজবুত এবং ভিজলে এদের শক্তি আরো বেড়ে যায়। এই তন্তুর মধ্য দিয়ে তাপ ভালো চলাচল করতে পারার কারণে গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্য এটা বেশ উপযোগী বস্ত্র। পরিধেয় পোশাক ছাড়াও টেবিল মোছার কাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি তৈরিতে এই তন্তু ব্যবহার করা হয়।

রেশম তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য– তোমরা জেনে রাখো যে, প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় তন্তু হচ্ছে রেশম তন্তু। গুটি পোকার লালারস থেকে রেশম উৎপাদিত হয়। রেশম খুবই মোলায়েম ও মজবুত তন্তু। রেশমের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি। নিজস্ব উজ্জ্বলতার কারণে এই তন্তু থেকে উৎপাদিত রেশমি বস্ত্র বিলাসবহুল পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

ফ্ল্যাক্স তন্তুর তোয়ালে

উজ্জ্বল রেশমি বস্ত্র

পশমি বস্ত্র

পশম তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য–

পশম একটি প্রাণিজ তন্তু। বিভিন্ন লোমশ প্রাণীর ত্বকের উপর গজানো পশম বা চুল থেকে শীত নিবারণের জন্য এ তন্তু সংগ্রহ করা হয়। পশুদের মধ্যে ভেড়ার লোমই পশমি বস্ত্রে বেশি ব্যবহার করা হয়। পানি শোষণক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হলেও ভিজলে এদের আকৃতি ও শক্তি কমে যায়। এই তন্তুর মধ্য দিয়ে তাপ ভালো চলাচল করতে না পারার কারণে শীতকালের পোশাক হিসেবে মাফলার, সোয়েটার, শাল ইত্যাদি তৈরির জন্য এগুলো বেশ উপযোগী।

কৃত্রিম তন্তুর ভৌত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য– কৃত্রিম তন্তু যেহেতু মানুষ তৈরি করে তাই এদের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এদের উজ্জ্বলতাও বাড়ানো কমানো যায়। রেয়ন, পলিয়েস্টার, নাইলন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর উদাহরণ। কয়লা, বায়ু, পানি ইত্যাদি নাইলন তন্তুর মূল উৎস। কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র হালকা, মজবুত, নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় তোমরা এধরনের কাপড় পর্দা, কার্পেট, মশারি, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করতে পারবে। নিচে এরূপ কিছু সামগ্রীর চিত্র দেওয়া হলো–

কৃত্রিম তন্তুর কার্পেট

কৃত্রিম তন্তুর মশারি

কাজ- ১ নিচের ছকের বাম দিকের কলামে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের নাম উল্লেখ করা আছে। ডান দিকের কলামে এলোমেলোভাবে উৎসের নাম দেওয়া আছে। সঠিক উৎসটি তীরচিহ্নের সাহায্যে মিল করে দেখাও।

সুতি বস্ত্র	কয়লা, বায়ু, পানি
পশমি বস্ত্র	তুলা তন্তু
লিনেন বস্ত্র	গুটি পোকার লালারস
রেশমি বস্ত্র	ভেড়ার লোম
নাইলন বস্ত্র	তুলার আঁশ ও রাসায়নিক দ্রব্য
রেয়ন বস্ত্র	ফ্ল্যাক্স তন্তু

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎস অনুসারে বয়ন তন্তুকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে

গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

২. মোজা হিসেবে ব্যবহারিত হয় কোন তন্তু-

ক. পলিয়েস্টার খ. নাইলন

গ. সুতি ঘ. ফ্ল্যাক্স

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একজন বয়ন শিল্পী শীতকালীন পোশাক তৈরির জন্য কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে প্রাণিজ তন্তু ব্যবহারে আগ্রহ বোধ করেন। কিন্তু বিলাসবহুল পোশাক তৈরিতে তিনি গুটি পোকার লালারস থেকে প্রাপ্ত তন্তু ব্যবহার করেন।

৩. বয়ন শিল্পী প্রাণিজ তন্তু বেছে নেওয়ার কারণ-

ক. পানিতে ভিজালেও এর আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে

খ. তন্তুর মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল করা কঠিন

গ. রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে বিভিন্ন তন্তু তৈরি হয়

ঘ. সব তন্তুর মধ্যে এই তন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল।

৪. বিলাসবহুল পোশাক তৈরিতে উক্ত তন্তু বেছে নেওয়ার কারণ–

i . মিহিন সুতার কারণে তন্তুটি মোলায়েম

ii. সব ঋতুতেই উপযোগী

iii. এর নিজস্ব উজ্জ্বলতা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii

গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

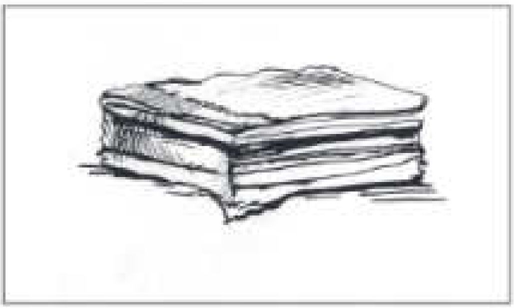

চিত্র-ক (সুতি)

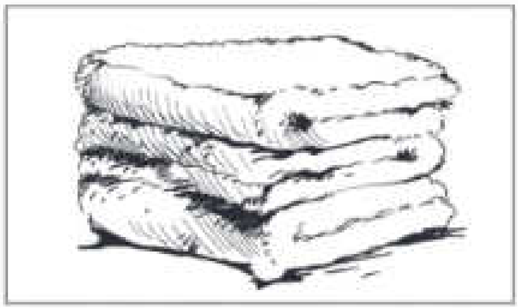

চিত্র-খ (ফ্ল্যাক্স তন্তু)

ক. উৎস অনুসারে বয়ন তন্তুকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

খ. কৃত্রিম তন্তু বলতে কী বুঝ?

গ. 'ক' চিত্রে ব্যবহারিত তন্তু সব মানুষ কেন বেশি ব্যবহার করে– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ক ও খ চিত্রের তন্তুর মধ্যে কী কী সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা লেখো।

চতুর্দশ অধ্যায়

পোশাকের যত্ন ও সংরক্ষণ

পাঠ ১- পোশাকের যত্ন

সভ্য সমাজে আমরা সবাই পোশাক পরিধান করি। কিন্তু সঠিক উপায়ে সবাই পোশাকের যত্ন নিতে পারে না। তোমরা কি নিজেদের পোশাকের যত্ন নাও? কীভাবে পোশাকের যত্ন নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

পোশাক পরিধানে ময়লা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ময়লা পোশাকটি সঠিক নিয়মে ধুয়ে, যথাযথ উপায়ে ভাঁজ করে, নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখাই হচ্ছে পোশাকের যত্ন। আবার সব সময় যে পোশাক পরিধান করলেই ময়লা হবে বা ধুতে হবে, এ ধারণা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ব্যবহারের পর অযথা ফেলে না রেখে যথাযথ উপায়ে ভাঁজ করে, নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখতে হবে। ব্যবহার করার ফলে যদি পোশাকটি ছিঁড়ে যায় বা পোশাকটিতে যদি দাগ লেগে যায়, তাহলে সেই ত্রুটি দূর করাও পোশাকের যত্নের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পোশাক-পরিচ্ছদ কতটুকু সুন্দর দেখাবে এবং কতদিন টিকে থাকবে তা তোমার উপরই নির্ভর করবে। তুমি যদি তোমার পোশাক অযত্নে রাখো, তাহলে অনেক সময় দামি পোশাকও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। পোশাকের যত্নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. পোশাকের দৈনিক যত্ন- প্রতিদিন পোশাকের যে যত্ন নিতে হয় তাই হচ্ছে পোশাকের দৈনিক যত্ন। তোমরা প্রতিদিন যে পোশাক পরিধান কর তা গোসলের সময় সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে এবং বাইরের ব্যবহৃত পোশাকগুলো ধোওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রোদে শুকিয়ে যথাযথ স্থানে তুলে রাখতে পার। নতুবা প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে পাবে না।

দৈনিক পোশাক ধোওয়া

পোশাক শুকানো

যথাযথ স্থানে তুলে রাখা

কাজ-১ তুমি কীভাবে পোশাকের দৈনিক যত্ন নিবে- ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

২. পোশাকের সাপ্তাহিক যত্ন- সপ্তাহের ছুটির দিনটিতে বোতাম লাগানোর প্রয়োজন থাকলে বোতাম লাগাবে, পোশাক ছেঁড়া থাকলে মেরামত করবে এবং নিজের পোশাক নিজে ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখবে। জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি এই দিনেই পরিষ্কার করতে পার। পোশাকের সাপ্তাহিক যত্ন সংক্রান্ত কাজের সময় বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা রাখলে ভালো হয়। যেমন- গান শুনতে শুনতে এ কাজগুলো করলে কাজে ক্লান্তি আসবে না। পোশাকের সাপ্তাহিক যত্ন নিলে পরবর্তী সপ্তাহের পোশাকের জন্য তোমার কোনো চিন্তা থাকবে না।

পোশাকের সাপ্তাহিক যত্ন

৩. মৌসুমি যত্ন- আমাদের দেশ ষড় ঋতুর দেশ হলেও তিনটি ঋতুতে পোশাকের যে যত্ন নিতে হয় তাকেই মৌসুমি যত্ন বলে। তোমার পোশাকের মৌসুমি যত্ন তুমি নিজেই নিতে পারবে। এক্ষেত্রে গ্রীষ্মের শেষে পাতলা সুতির পোশাকগুলো ধুয়ে ইস্ত্রি করে নির্ধারিত জায়গায় তুলে রাখবে। বর্ষার শেষে কৃত্রিম তন্তুর পোশাকগুলো ধুয়ে যথাযথ জায়গায় ভাঁজ করে রাখলেই হয়, ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে শীতের শেষে পশমি সোয়েটার, জ্যাকেট, মোজা, মাফলার, টুপি ইত্যাদি পোশাক ধুয়ে অথবা ধোওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রোদে শুকিয়ে আলগা ময়লা অপসারণ করে ভাঁজ করে উঠিয়ে রাখতে হয়। এতে করে পরবর্তী বছর পুনরায় নতুন করে পোশাক কিনতে হয় না এবং প্রয়োজনের সময় সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়।

পোশাকের মৌসুমি যত্নে শীতকালীন পোশাক ও ভাঁজ করা কম্বল

কাজ- ২ তোমার এক বন্ধু প্রায়ই ক্লাসে নোংরা পোশাক পরিধান করে আসে। কোনো কোনো সময় তার পোশাকে বোতাম, জিপার ছেঁড়া অবস্থায় দেখা যায়। তুমি এক্ষেত্রে তাকে কী পরামর্শ দিবে?

পাঠ ২- পোশাক সংরক্ষণ

পূর্বের পাঠে তোমরা পোশাকের যত্নের প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জেনেছ। পোশাকের যত্নের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি বিষয় হচ্ছে পোশাক সংরক্ষণ। অব্যবহৃত জামা কাপড় উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলে পোকামাকড়, ধুলাবালি ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু পোশাক একটি ব্যয়বহুল সামগ্রী, তাই যথাযথভাবে এগুলো সংরক্ষণ না করলে পোশাকের আয়ু কমে যায় এবং অর্থেরও অপচয় ঘটে। তাই পোশাক যেন সুন্দর ও পরিপাটি রাখা যায় সেজন্য তোমাকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে-

১. পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে ধোওয়া ও ভালোভাবে শুকানোর পর সংরক্ষণ করতে হবে। ধোওয়ার সময় পোশাকটি কোন তন্তুর তৈরি তা খেয়াল রাখতে হবে। কারণ একেক তন্তুর বস্ত্র ধোওয়ার পদ্ধতি একেক রকম। যেমন-

ক) সুতি ও লিনেন বস্ত্রের পোশাক একসাথে ধোওয়া যেতে পারে। পরিষ্কার করার জন্য সাবান, সোডা, রিঠার পানি, ক্লোরিন, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। উন্নতমানের সুতি, লিনেন বস্ত্রের পোশাকের ক্ষেত্রে মৃদু গুঁড়া সাবান ব্যবহার করতে হবে। সাদা কাপড়কে আরো ধবধবে করার জন্য নীল দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এরূপ বস্ত্রে মাড় দেওয়া যায়। এ ধরনের বস্ত্রে গরম পানি ব্যবহার করলেও ক্ষতি নেই। রোদে শুকালে ভালো হয়। তবে রঙিন বস্ত্র ছায়ায় শুকানো উচিত।

খ) রেশমি পোশাক হালকা গরম পানির সাথে মৃদু সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুতে হয়। এরূপ বস্ত্রাদির পোশাক খুব চাপ দিয়ে ধোওয়া উচিত না। আলতোভাবে ধুয়ে ছায়ায় শুকাতে দিতে হয়। পশমি বস্ত্রেও হালকা গরম পানির সাথে মৃদু সাবান ব্যবহার করতে হয়। তবে শুকানোর সময় হ্যাঙ্গারে না ঝুলিয়ে সমতলে বিছাতে হয়। নতুবা এদের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। রেশমি ও পশমি বস্ত্রের পোশাক কখনও মোচড় দিয়ে নিংড়ানো যাবে না।

২. সুতি ও লিনেন বস্ত্রাদির পোশাক দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করতে হলে মাড় দিবে না, এতে করে পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে।

৩. সিল্ক কাপড়ের পোশাক ধুয়ে ইস্ত্রি করে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। ইস্ত্রি করার সময় তোমাকে বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যেমন–

ক) সুতি ও লিনেন বস্ত্রাদির পোশাক হালকা ভেজা থাকতে ইস্ত্রি করতে হয়। কাপড়টি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে পানির ছিটা দিয়ে তন্তু নরম করে নিতে হয়।

খ) রেশমি-পশমি বস্ত্রের উপর পাতলা একটি ভেজা কাপড় রেখে হালকা চাপ ও তাপে ইস্ত্রি করতে হবে।

গ) যেকোনো পোশাকই ইস্ত্রি করার সময় তোমাদের ভাঁজের কৌশলের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ হাতার ভাঁজ বা পোশাকের চূড়ান্ত ভাঁজ যদি সঠিক না হয় তাহলে সম্পূর্ণ পোশাকটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

ইস্ত্রির পর ভাঁজ করা পোশাক

ঘ) ইস্ত্রি করার পর সাথে সাথে আলমারিতে সংরক্ষণ না করে বাতাসে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। নতুবা তিলা পরার আশঙ্কা থাকে।

৪. পশমি বস্ত্রের পোশাক ধোওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রোদে শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখতে হয়।

৫. পোশাক সংরক্ষণের স্থানটিতে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে রাখলে পোকামাকড় ও ছত্রাকের আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬. সংরক্ষণের আগে সংরক্ষণের স্থানটি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে কীটনাশক দিয়ে স্প্রে করে নিলে ভালো হয়।

৭. দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করতে হলে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন, কালিজিরা, মখমল, শুকনো নিমপাতা ইত্যাদি দিতে হবে।

৮. বর্ষা ঋতুর আগে ও পরে সংরক্ষিত কাপড়গুলো রোদে ভালো করে মেলে শুকিয়ে নিলে অনেকদিন যাবত কাপড় ভালো থাকে।

কাজ- ১ মৌসুম অনুযায়ী কোন তন্তুর পোশাক কিভাবে সংরক্ষণ করবে তার উপর ভিত্তি করে একটি চার্ট দলগতভাবে উপস্থাপন করো।

কাজ- ২ শ্রেণিকক্ষে ইস্ত্রির ভাজ করার কৌশল উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পোশাকের যত্নকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার

২. কোন ধরনের তন্তুর পোশাকগুলো একসাথে ধোওয়া যায়?

ক. সুতি ও লিনেন খ. লিনেন ও রেশমি

গ. সুতি ও পশমি ঘ. রেশমি ও পশমি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জেবা আলমারিতে তুলে রাখার জন্য তার সুতি শাড়িগুলো ধুয়ে মাড় না দিয়ে হালকা ভেজা থাকতেই ইস্ত্রি করল।

৩. জেবা হালকা ভেজা থাকতেই শাড়িগুলো ইস্ত্রি করল কেন?

ক. বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে

খ. কাপড়ের আকৃতি ঠিক রাখতে

গ. তন্তু নরম রাখতে

ঘ. কাপড়ের গরম ভাব দূর করতে

৪. জেবা শাড়িতে মাড় না দেওয়ার কারণ–

i. দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা

ii. পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা

iii. সময় বাঁচানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. লাবণ্য শীতের শেষে তার সোয়েটার জ্যাকেট মোজা মাফলার ধুয়ে শুকিয়ে আলমারিতে তুলে রাখল। একদিন বেড়াতে যাওয়ার জন্য তার সিল্কের জামাটি আলমারি থেকে বের করে দেখল জামাটি পোকায় কেটেছে।

ক. রঙিন পোশাক কোথায় শুকানো উচিত?

খ. পোশাকের যত্ন বলতে কী বোঝায়?

গ. লাবণ্য তার শীতের পোশাকগুলোর কোন ধরনের যত্ন নিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবেই লাবণ্যর জামাটি নষ্ট হয়েছে। বুঝিয়ে লেখো।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেলাইয়ের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়

পাঠ ১- বিভিন্ন মেশিনের পরিচিতি

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লিমার বড় বোন কলেজে পড়ে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে নিজের পোশাক নিজেই তৈরি করে। বোনের কর্মদক্ষতায় তার মা-বাবা খুব খুশি। বন্ধুরাও তার তৈরি পোশাকের যথেষ্ট প্রশংসা করে। লিমাও তার বোনের মতো কাজ করতে চায়। কিন্তু লিমার মা জানান যে, এখন তার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, সেলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। পোশাক তৈরির কাজে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। এসব সরঞ্জাম ছাড়া পোশাক তৈরি করা সম্ভব হয় না। সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম যদি হাতের কাছে থাকে তবে কাজ করতে সুবিধা হয়, সময় বাঁচে ও বিরক্তি আসে না।

হাত মেশিন

সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো সেলাই মেশিন। মানুষের কল্যাণে আজ পর্যন্ত যেসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সেলাই মেশিন অন্যতম। সেলাইয়ের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের তুলনায় এই মেশিন বেশ বড় এবং এর দামও বেশি। বাজারে সাধারণত তিন ধরনের সেলাই মেশিন পাওয়া যায়, যেমন– হাত মেশিন, পা মেশিন ও বৈদ্যুতিক মেশিন। এসব মেশিনের সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর বৈচিত্র্যময় পোশাক ও গৃহসজ্জার সামগ্রী সেলাই করা যায়।

(১) হাত মেশিন– হাত মেশিন চালাতে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় না। বাম হাত দিয়ে কাপড় ধরে, ডান হাত দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে সেলাই কাজ করতে হয়। অন্যান্য মেশিনের তুলনায় এই মেশিনের দাম কম এবং যত্ন নেওয়াও সহজ।

পা মেশিন

(২) পা মেশিন– এই মেশিন চালাতেও বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় না। পায়ের চাপের সাহায্যে প্যাডেল নাড়াচাড়া করে এই মেশিন চালানো হয়। এই মেশিন ব্যবহারের সময় আমরা দুই হাতের সাহায্যেই কাপড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। হাত মেশিনের মতো এই মেশিনেরও যত্ন নেওয়া সহজ।

(৩) বৈদ্যুতিক মেশিন– এই মেশিনে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে অল্প পরিশ্রমে অনেক কাপড় সেলাই করা যায়। অন্যান্য মেশিনের তুলনায় এই মেশিনের দাম বেশি হলেও চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের কাজ তা দিয়ে করা যায়। এই মেশিন ব্যবহার ও যত্ন নেওয়ার সময় দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বৈদ্যুতিক মেশিন

কাজ-১ বিভিন্ন ধরনের মেশিনের সুবিধা-অসুবিধাগুলোর পার্থক্য উল্লেখ করো।

সেলাই মেশিন ছাড়া সেলাই কাজে আনুষঙ্গিক আরও নানারকম সরঞ্জামের দরকার হয়। ব্যবহার অনুযায়ী এগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এ সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে আলোচনা করা হলো।

পাঠ ২– মাপ নেওয়া, কাটা ও দাগ দেওয়ার সরঞ্জাম

(ক) মাপ নেওয়ার সরঞ্জাম

যে কোনো সুন্দর মানানসই ফিটিং পোশাকের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিকভাবে পরিধানকারীর দেহের মাপ নেওয়া। এই মাপের উপর ভিত্তি করে পোশাকের নকশা আঁকা হয়। দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়ার জন্য কিছু সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। যেমন– মাপের ফিতা, স্কেল, গজ কাঠি ইত্যাদি।

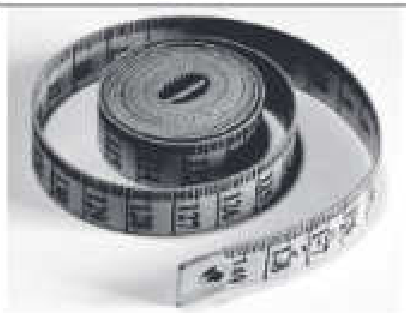

মাপের ফিতা

স্কেল

(খ) কাটার সরঞ্জাম

উপযুক্ত সরঞ্জাম ছাড়া কোনো কাপড়ই সুন্দরভাবে কাটা যায় না। সুন্দরভাবে কাটা না গেলে পোশাকের নকশাও ঠিকমতো ফুটে ওঠে না। কাপড় ছাঁটার জন্য মাঝারি ধরনের ধারালো কাঁচি, সুতা কাটার জন্য ছোট কাঁচি এবং পোশাক প্রস্তুতের পর পোশাকের প্রান্তধার কাটার জন্য পিংকিং শিয়ার ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সেলাই খোলার জন্য বডকিন এবং বোতাম ঘর কাটার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

কাপড় কাটার কাঁচি

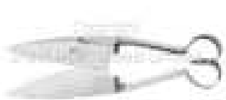

সুতা কাটার কাঁচি

পিংকিং শিয়ার

বডকিন

(গ) দাগ দেওয়ার সরঞ্জাম

পোশাকের নকশা আঁকা ও নকশার বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় দাগ বা মাপের চিহ্ন দেওয়ার জন্য কিছু সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। যেমন– পেন্সিল, টেইলারিং চক, কার্বন পেপার, বিভিন্ন রঙের সুতা, দাগ মোছার জন্য রাবার ইত্যাদি।

টেইলারিং চক	টেইলারিং পেন্সিল	বিভিন্ন রঙের সুতা

পাঠ ৩- চাপ দেওয়া ও হাতে সেলাই করার সরঞ্জাম

(ক) চাপ দেওয়ার সরঞ্জাম

পোশাকের বিভিন্ন অংশে ছাঁটার আগে ও সেলাই করার পর তাদের আকৃতি সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য ইস্ত্রি করা বা চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। পোশাকের বিভিন্ন অংশ যেমন– কলার, পকেট, বোতাম পট্টি, প্রভৃতি তৈরির পর ভালোভাবে ইস্ত্রি করে নিলে আকৃতি সুন্দর ও পরিপাটি হয়। এরপর অন্য অংশের সাথে সেলাই জুড়ে দিলে সম্পুর্ণ পোশাকটি দেখতে সুন্দর হয়। চাপ দেওয়ার জন্য সাধারণত সঠিক ওজনের ইস্ত্রি, সঠিক উচ্চতার টেবিল দরকার হয়।

ইস্ত্রি

ইস্ত্রি বোর্ড / টেবিল

(খ) হাতে সেলাই করার সরঞ্জাম

একটি পোশাক সেলাই করার সময় যদিও এর বেশির ভাগ অংশ মেশিনে সেলাই করতে হয়, তবুও বেশ কিছু অংশ পরিপাটিভাবে সমাপ্ত করার জন্য হাতে সেলাই করতে হয়। হাতে সেলাই করার জন্য ছোট বড় নানা সাইজের সুচ, নানা রঙের সুতা, ফ্রেম, ছোট কাঁচি ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

সুচ-সুতা

ফ্রেম

সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলোকে খুব যত্নের সাথে একটি বাক্সে রাখলে ভালো হয়। এগুলো গোছানো থাকলে প্রয়োজনে সহজেই পাওয়া যায় এবং এগুলোর সাহায্যে হাতের কাজ খুব ভালোভাবে করা যায়।

কাজ– ৩ পোশাক তৈরির সময় কোন কোন সরঞ্জাম প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৪- বিভিন্ন ফোঁড়ের পরিচিতি (রান ও বখেয়া)

পূর্বের পাঠে তোমরা সেলাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছ। এই পাঠে তোমরা সামান্য সুচ সুতা দিয়ে অতি সাধারণ একটি কাপড়কে কীভাবে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা যায়, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। অর্থাৎ এই পাঠে তোমরা বিভিন্ন ফোঁড়ের মাধ্যমে সুচিশিল্পের দক্ষতা অর্জন করবে। এ কাজ করার সময় তোমাকে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন−

(ক) নকশাটি যেন কাপড়ের উপর ফুটে ওঠে সেদিকে লক্ষ রেখে কাপড় নির্বাচন করতে হবে।

(খ) সঠিক স্থানে সঠিক রঙের সুতা ব্যবহার করতে হবে।

(গ) এমব্রয়ডারি করার সময় চিকন সুচ ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) কাপড় যেন কুঁচকে না যায় সেদিকে লক্ষ রেখে সুতার টান ঠিক রাখতে হবে।

(ঙ) নকশা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়ের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে।

(চ) চর্চার মাধ্যমে নিখুঁত ফোঁড় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।

হাতের সাহায্যে সুচ সুতা দিয়ে কিভাবে একটি কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের ফোঁড় সৃষ্টি করা যায় এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো−

রান ফোঁড়

সুতাসহ সুচ কাপড়ের নকশার মধ্যে ঢুকিয়ে কয়েকবার উপর নিচ করে ছোট ছোট ফোঁড় দিয়ে বের করে এনে রান ফোঁড় সম্পন্ন করা হয়। ফোঁড়গুলো সর্বত্র প্রায় সমান আকৃতির হতে হয়। এটা সবচেয়ে সহজ ফোঁড়। এই ফোঁড়ের সাহায্যে সাধারণ পোশাক তৈরি করা ছাড়াও নকশিকাঁথা, কুশন কভার, সোফা ব্যাক ইত্যাদি নকশা সেলাই করতে পারবে।

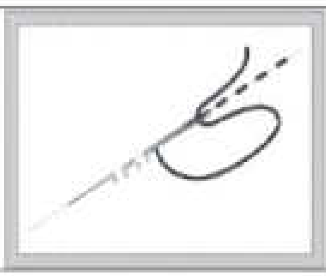	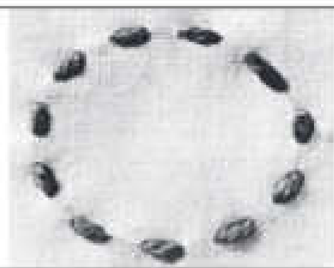	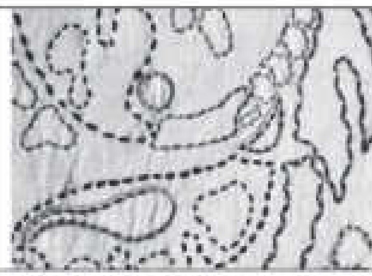
রান ফোঁড়	রান ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন	রান ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন

কাজ− ১ সুচে সুতা ভরে গিট দাও এবং একটি কাপড়ে রান ফোঁড়ের মাধ্যমে নকশা তৈরি করো।

টাক দুই বা ততোধিক কাপড়ের টুকরা সাময়িকভাবে জোড়া দিতে রান ফোঁড়ের চেয়ে বড় বড় যে সেলাই অস্থায়ীভাবে করা হয় তাকে টাক সেলাই বলে। মেশিনে চূড়ান্ত সেলাই দেওয়ার পর এই টাক সেলাই খুলে ফেলতে হয়।	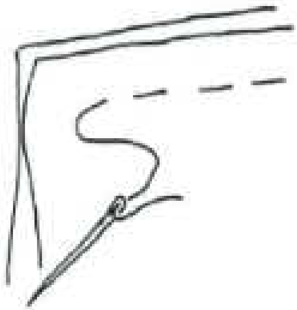	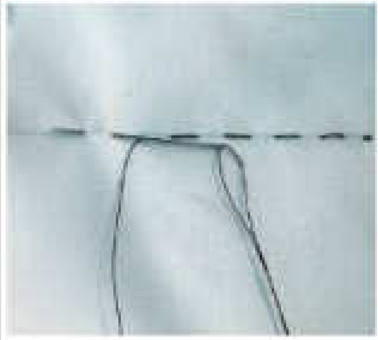

টাক সেলাই

কাজ– ২ সুচে সুতা ভরে গিঁট দাও এবং একটি কাপড়ে টাক সেলাইয়ের চর্চা করো।

বখেয়া ফোঁড়

বখেয়া সেলাই করার সময় প্রথমে কাপড়ে সুতা আটকিয়ে সুচকে একটু পেছনে এনে আর একটি ফোঁড় দিতে হবে। এই দ্বিতীয় ফোঁড়ে সুচের অগ্রভাগ প্রথম ফোঁড় থেকে একটু সামনে উঠবে। পরবর্তী ফোঁড়ও একইভাবে তুলতে হয়, তবে প্রথম ফোঁড় যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানেই সুচ তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফোঁড় পরস্পরের গায়ে লেগে থাকে। এই ফোঁড় বেশ মজবুত হয় এবং সোজা দিক দেখতে মেশিনের সেলাইয়ের মতো হয়। এই ফোঁড়ের উল্টোদিক ডাল ফোঁড়ের মতো দেখায়। নকশার ধার, গাছের ডাল, পাতা প্রভৃতিতে নকশার জন্য এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

		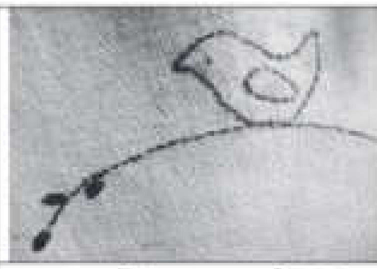
বখেয়া ফোঁড়	বখেয়া ফোঁড়	বখেয়া ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন

কাজ– ৩ বখেয়া ফোঁড়ের সাহায্যে একটি কাপড়ে ডিজাইন তৈরি করো।

পাঠ-৫ হেম, চেইন, লেজি ডেজি ও ডাল ফোঁড়

হেম

গলায়, হাতের মুড়িতে, জামা বা ব্লাউজের নিচের ধারে, ট্রে ক্লথ, টেবিল ক্লথ ও রুমালের কিনারায় কাপড় ভাঁজ করে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের উল্টো দিকে হেম সেলাই করা হয়। এই ফোঁড় দিতে হলে সুচে সুতা ভরে নিচের চিত্রের ন্যায় মূল কাপড়ে ছোট্ট একটি ফোঁড় দিয়ে ভাঁজ করা কাপড়ে তেরছাভাবে আর একটি ফোঁড় তুলে আনতে হয়।

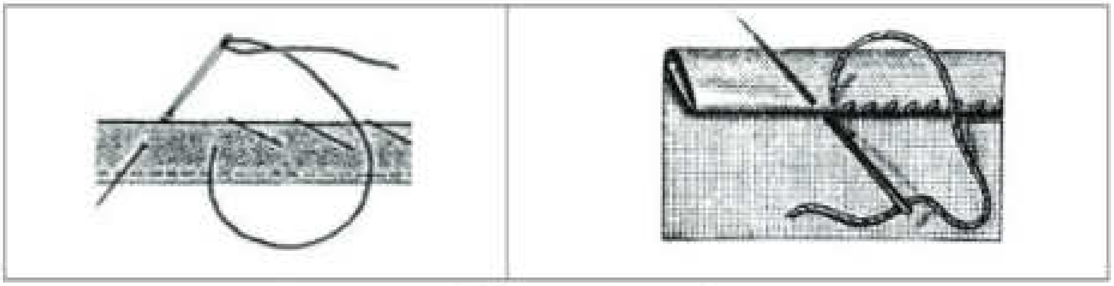

বিভিন্ন ধরনের হেম সেলাই

> কাজ–১ একটি ট্রে ক্লথের কিনারায় কাপড় ভাঁজ করে হেম ফোঁড়ের সাহায্যে সেলাই করো।

চেইন ফোঁড়

দেখতে শিকলের মতো হয় বলে একে চেইন ফোঁড় বলে। এ সেলাই করতে প্রথমে কাপড়ের পেছন থেকে সুতা তুলে সুচ দিয়ে বাম দিকে একটি ফোঁড় তোলা হয় এবং সুতা দিয়ে সুচের ঠিক আগায় একটি ফাঁস তৈরি করা হয়। তারপর সুচ টেনে বের করতে হয়। পরের বার ফোঁড় ওঠাবার সময় ঠিক আগের ফোঁড়ের মধ্য থেকে ওঠাতে হবে । নকশার কিনারা, ডাল, পাতা প্রভৃতি তৈরির কাজে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

	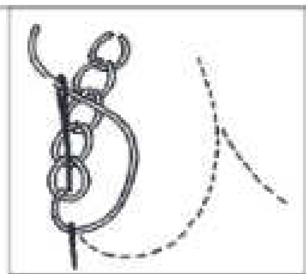	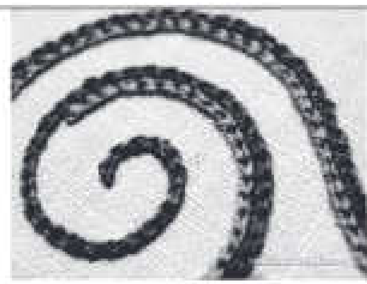
চেইন ফোঁড়	চেইন ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন	চেইন ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন

> কাজ– ২ চেইন ফোঁড়ের সাহায্যে নকশার কিনারা ফুটিয়ে তোলো।

লেজি ডেজি ফোঁড়

একটি বড় চেইন ফোঁড় তৈরি করে তার উপরের অংশে একটি ছোট ফোঁড় দিয়ে কাপড়ের সাথে আটকে দিলে লেজি ডেজি ফোঁড় তৈরি হয়। বিভিন্ন নকশায় ছোট ফুলের পাপড়ি এবং পাতা তৈরি করতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।	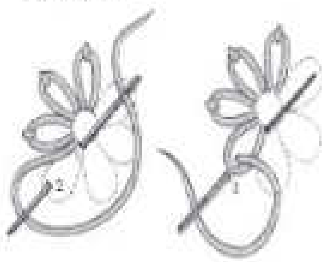
	লেজি ডেজি ফোঁড়

কাজ– ৩ লেজি ডেজি ফোঁড়ের সাহায্যে ফুলের নকশা তৈরি করো।

ডাল ফোঁড়

এই সেলাই করার জন্য প্রথমে সুচকে কাপড়ের নিচ থেকে উপরের দিকে তুলবে। প্রথম ফোঁড়ে সুচের অগ্রভাগ যেখানে উঠবে সেখান থেকে দুই তিনটি সুতা ছেড়ে দিয়ে একটু বাঁকা করে দ্বিতীয় ফোঁড়টি তুলতে হবে। পরবর্তী ফোঁড়গুলো এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।এই ফোঁড় দেখতে অনেকটা গাছের ডালের সঙ্গে জড়ানো লতার মতো হওয়ায় ডাল-পালার নকশা ফুটিয়ে তুলতে এই ফোঁড় ব্যবহার করতে পার।

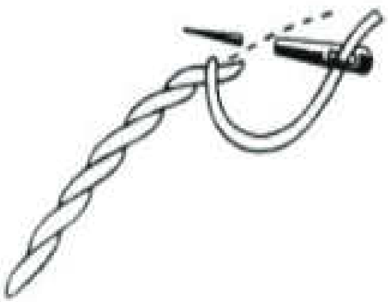	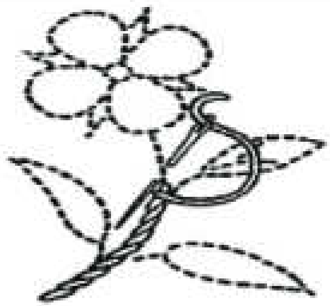
ডাল ফোঁড়	ডাল ফোঁড়ের সাহায্যে ডিজাইন

কাজ– ৪ একটি কাপড়ে ডাল ও পাতার ছবি এঁকে ডাল ফোঁড় প্রয়োগ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহের মাপ নেওয়ার জন্য কোন সরঞ্জামটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ট্রেসিং হুইল খ. সিম রোল

গ. মাপের ফিতা ঘ. টেইলারিং চক

২. ফ্রকের প্রান্তধার মুড়িয়ে সেলাই করতে কোন ফোঁড় ব্যবহার করা হয়?

ক. রান খ. হেম

গ. বখেয়া ঘ. টাক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুলিয়া তার বাচ্চাদের জামা নিজেই তৈরি করেন। তবে জামা তৈরি করার সময় চূড়ান্ত সেলাইয়ের আগে ভিন্ন একটি ফোঁড় ব্যবহার করে সেলাই করেন।

৩. জুলিয়া কোন ফোঁড়টি ব্যবহার করে?

ক. রান খ. টাক

গ. হেম ঘ. চেইন

৪. জুলিয়া পোশাক সেলাইয়ের সময় ভিন্ন একটি ফোঁড় ব্যবহার করেন। কারণ–

i. পোশাকের মাপ ঠিক করা

ii. পোশাকটি আকর্ষণীয় করা

iii. খরচ বাঁচানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পোশাক সেলাইয়ের কাজ করে রুমাকে সংসার চালাতে হয়। সে একটি হাত মেশিন, কাঁচি ও গজ ফিতা নিয়ে এ কাজ করে। বুটিক শপের জন্য দোকানিরা তার তৈরি পোশাকগুলোর কলার, কাফ, পকেট, প্লিট, বোতাম ঘর ইত্যাদির ফিনিশিং দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে পোশাকগুলো ফেরত দেয়। এ ছাড়াও পাড়ার লোকদের অর্ডার সঠিক সময়ে বুঝিয়ে দিতে না পেরে রুমা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ক. পিং কিং শিয়ারের কাজ কী?

খ. পোশাকে দাগ দেওয়ার সরঞ্জাম বলতে কী বোঝায়?

গ. সেলাই কাজের জন্য রুমার মেশিনটি নির্বাচন কি সঠিক হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবেই রুমা লাভবান হতে পারছে না। বুঝিয়ে লেখো।

২. নিরুপমা কিছুদিন হলো সুচি শিল্পের কাজ শিখেছে। তাই সে রুমালে সুচি কাজ করবে বলে ঠিক করল। রুমালের এক কোনায় ডালসহ একটি ফুলের নকশা এঁকে টাক ও হেম সেলাই দিয়ে নকশাটি করল। সেলাই শেষে দেখা গেল নকশাটি কুঁচকে আছে। রুমালটিও ছিদ্র হয়ে গেছে।

ক. বডকিন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

খ. পরিধানকারীর দেহের মাপ নেওয়া বলতে কী বোঝায়?

গ. নিরুপমা রুমালের নকশায় সঠিক ফোঁড় ব্যবহার করেছে কি না? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসরণ না করায় নিরুপমার রুমালের নকশাটি নষ্ট হলো। আলোচনা করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।